অমৃতস্য পুত্রী

[অকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত ১৩৮৯]

কমল দাশ

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

৺ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে
যাঁর আশীর্বাদ
আমরা দুজনেই প্রার্থনা করি

অমৃতস্য পুত্রী

এই লেখিকার

জানা অজানা

উত্তরে মেরু দক্ষিণে বন

কেক চকোলেট আর রূপকথা

"প্রাণচঞ্চল। স্পন্দিত। মানে কলকাতাকে দেখলে আমার মনে পড়ে যায় কবির একটি লাইন—জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।"

"থাক্ থাক্। খুব হয়েছে রিণ, তুই যে রেটে কলকাতার প্রেমে পড়ে আছিস তাতে কোন মানব জাতীয় প্রেমিককে তোর চোখেই পড়বে না।"

"ঠিক বললি নারে, সু। আমি শুধু যে কলকাতার প্রতিটি মানুষকে ভালোবাসি, তা নয়। প্রতিটি জিনিস, এই আকাশ, এই বাতাস, এই পাখির গান, এমন কি তার সব কিছু, তার ভালো-মন্দ সব। সব নিয়ে তাকে আমি ভালোবাসি।

চোখ পাকিয়ে বন্ধুর দিকে ফিরে সঙ্গীতা বলে উঠল, "এ ত ভালো কথা নয়রে, রিণ। তোকে যে শেষে জেলে পচে মরতে হবে।"

"মানে?"

"মানে ত অতি পরিষ্কার। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড অনুসারে হৃদয় দান একমেবাদ্বিতীয়ম্-কেই করা চলে। অবশ্য একটির পর একটিতে কোন দোষ নেই।"

"ও এই কথা। তুই ত রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিলি।"

দুই বন্ধুতে হো-হো করে হেসে উঠল।

রেড রোড দিয়ে মোটর ছুটে চলেছে। সঙ্গীতার হাতে হুইল। পাশে রিণরিণ।

দু'জনেরই বব্ করা শ্যাম্পু করা সিল্কি রেশমের মত চুলগুলো মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে হাওয়ায় উড়ছে।

পেছনে যদি কোন পরজাতীয় থাকত, তবে তার নিশ্চয়ই চিত্ত হয়ে উঠত চঞ্চল বা আবেশে সে হয়ে যেত স্পেলবাউণ্ড। মন্ত্রমুগ্ধ।

যাক, সে দুর্ভাবনা নেই। কেন না পিছনে যিনি বসে আছেন

তিনি এ সবের ঊর্ধ্বে। সাক্ষাৎ সাধু পুরুষ। সাধু পুরুষ এইজন্য বললাম, পুরুষ ত বটেই। আর সাধু না বলে কি বলব, এত সবের পরও তাঁর এতটুকু চাঞ্চল্য নেই।

ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দিয়ে স্প্যানিয়েল কুকুর সুসি চারদিক পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। এই সব বাচ্চাদের কথায় কান দেবার সময় তার নেই।

হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল, মানে জোরে ব্রেক্ কষে থামিয়ে দিতে হোল।

"কি হোল রে, সু ?"

"দেখ তাকিয়ে, সামনে তোর ভালোবাসার প্রাণবন্ত কলকাতা। ট্রাফিক লাইট খারাপ হয়ে গেছে। সবাই ত স্পন্দিত, তাই থামতে পারছে না কেউ। প্রত্যেকেই এগিয়ে চলেছে। ব্যস, একের পর এক জট পেকে গেছে। নাও, ঠেলা সামলাও।"

"তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? আমার ত বেশ লাগছে। সবাই হর্ন টিপছে, যদিও কোন মানে নেই। নানা সুরের হর্ন। একটা অর্কেস্ট্রার আভাস পাচ্ছিস না ?"

"যাঃ রিণ, ভালো লাগে না। তোর সবেতেই শুধু ছেলেমানুষী। যাচ্ছি সিনেমায়। এখন কি হবে ? কে জানে, কখন গিয়ে পৌঁছাতে পারব।"

"জানিস সু, পাঁচ বৎসর প্যারিসে থেকে নিয়মানুবর্তিতা দেখে দেখে মনটা যেন কেমন মিইয়ে গিয়েছিল। ও বাবাঃ, তুই যে রেগে টং হয়ে গেছিস। ঘাবড়াও মৎ, ব্যবস্থা করছি।"

বলেই দরজা খুলে রিণরিণ রাও লাফিয়ে নেমে পড়ল। স্ল্যাক্স পরা আর একটা স্মার্ট বুশ শার্ট !

"আরে আরে, কোথায় চললি ?"

"ট্রাফিক কণ্ট্রোল করতে।"

কিছু বলবার আগেই সঙ্গীতা দেখল তার বন্ধু জ্যামের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেগুলার ট্রাফিক পুলিসের মতো হাত-পা নেড়ে অর্ডার চালাচ্ছে।

এখানে মাঝে মাঝে ছেলেরা এই অবস্থায় ট্রাফিক পুলিসের কাজ করে। কিন্তু মেয়েরা ?

তাই কেউ কথা শুনছিল, কেউ শুনছিল না। কেউ কেউ আবার তামাশা দেখবার জন্য ভিড় কবার চেষ্টা করছিল।

সঙ্গীতা মহা ফাঁপরে পড়ে গেছে। কি করবে! রিণিকে ও ভালো করেই চেনে। ও যা করবে, তা করবেই। ওকে ত নড়ানো যাবে না।

পুলিসের কোন দিকেই কোন হদিস নেই। সুসি আবার গলা ছেড়ে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে। লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামবার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখল, ভিড় ঠেলে একটি ছেলে রিণির দিকে যাচ্ছে দৃপ্ত পদক্ষেপে। বাঙালীর মতো চেহারা। চোখা-চোখা কিন্তু কোমল চালচলনে অবাঙালী তা পরিষ্কার মনে হয়।

আশ্চর্য পরিষ্কার বাংলায় কিন্তু সে বলে উঠল, "আপনারা ওঁনার কথা শুনছেন না। জানেন, উনি কে? পুলিস অফিসার। অফ ডিউটিতে, তাই সাধারণ পোশাক পরা। আপনাদের গাড়ির নম্বর যদি টুকে নিয়ে থাকেন, মুশকিলে পড়বেন। যাক, আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন যান। আমি এখানে থাকছি যতক্ষণ পুলিস এসে না পৌঁছাচ্ছে।"

অক্লেশে ছেলেটি দাঁড়িয়ে কণ্ট্রোল করতে লাগল। রিণরিণ আস্তে আস্তে এসে গাড়িতে উঠল।

"যাক, বাঁচা গেল। তুই যা ভাবিয়ে তুলেছিলি। ভুলে যাচ্ছিস এটা প্যারিস নয়, কলকাতা।"

রিণি কোন উত্তর দিল না। গাড়ি ছুটে চলল সিনেমা হাউসের দিকে।

"কিরে, কি হোল? তুই যে একেবারে চুপ মেরে গেলি, রিণ। কে রে ছেলেটা?"

"জানি না ত।"

"নাম জিজ্ঞাসা করলি না ?"

"না।"

"এ আবার কি ? বেশ ছেলেটা। আবার কি করে দেখা হবে ?"

"দেখা হবার হলে ঠিকই হবে।"

মেন ছবিটা জাস্ট আরম্ভ হয়েছে। অন্ধকারের মধ্যেই টর্চ লাইটের সাহায্যে ও বসা লোকদের অভিশাপ কুড়োতে কুড়োতে ওরা যে যার সিটে বসে পড়ল।

"যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত পৌছান গেছে। আমার ত মনে হচ্ছিল আজ আর গন্তব্যস্থলে পৌছান যাবে না। দুটো টিকিটই যাবে মাঠে মারা। সঙ্গে একটা সোনালী সন্ধ্যা।"

"সু, একটা কথা বলব ? স্পিকটি নট্। পারিস ও কথা বলতে। কোথায় বুঝতে চেষ্টা করব, ঠিক কোথায় আছি, ব্যাপারটা কি। না, বকে চলেছিস। কপাল গুণে জুটিয়েছিস তো ভোলানাথ বোধিসত্ত্বকে। না হলে যে কি হোত।"

"আমার ত বয়ে গেছে জোটাতে। চারজনে মিলে জুটিয়েছে। থার্ড, দু'জনে মিলে জোটাতে লেগেছে।"

সামনের থেকে একটা ছেলে বলে উঠল, "প্লিজ !"

দু'জনেই, 'সরি' বলে তখনকার মত চুপ করে সিনেমাতে মন দিল।

হাসির ছবি। নূতন বিয়ের পর নূতনত্ব করবার জন্য 'লং লং ট্রেইলারে' করে চলেছে হানিমুন করতে। তার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া, রান্না করা, শোয়া সব কিছু। তার সঙ্গে দেশ দেখা চলবে। অভিনব কর্মসূচী।

অভিনব হলে যা হয়। যাকে বলে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। দুই আনাড়ীর ঘর-সংসার।

"আরে, নুন ত আনা হয় নি। ডিম পোচ কি করে খাওয়া যাবে ?"

ট্রেইলারের নীচে শুয়ে বব্ কি যেন ঠুকঠাক করছিল। মাথা বের

করে বলল, "ঠিক আছে, ডার্লিং। মাখন-রুটির সঙ্গে খেয়ে নিলেই হবে।"

ঠুক্-ঠাক্, ঠুক্-ঠাক্।

"নাঃ, বড্ড খিদে পেয়েছে। আগে খেয়ে নিই," বলে বব্ উঠে এসে দেখল লুসিল হাপুস নয়নে কাঁদছে।

"কি হোল? হাতে ফোস্কা পড়েছে?"

"তোমাকে তখনই বলেছিলাম সব টিন নিয়ে নাও। কাটব আর খাব। না, তুমি জেদ্ ধরলে, রান্না প্র্যাকটিস করতে হবে। সংসার করতে ত হবে।"

লুসিলের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে বব্ ভাবনায় পড়ে গেল। কি করে! ও ত শুধু কেঁদেই চলেছে।

"কি হয়েছে বলবে ত? খিদেতে ত পেট জ্বলে যাচ্ছে।"

"রুটি নেই, মাখন আছে।"

"এখন কি হবে? তুমি যে কি বাজারই করলে।"

"বারে! এই পর্যন্ত আমি ত মা-বাবার কাছে, না হলে হস্টেলে থেকেছি।"

"সেই জন্যই ত বলেছিলাম এ সব হাঙ্গামাতে কি দরকার। চল, কোথাও হোটেলে থেকে আসব। যত নষ্টের গোড়া ত তুমি। প্র্যাকটিস করব। কর এবার প্র্যাকটিস।"

"কি? দু'দিন না যেতেই তুমি আমাকে বকছ? আর তুমি বলেছিলে, জীবনেও আমাকে কড়া কথা বলবে না। তাই ত বিয়েতে মত দিয়েছিলাম। আর এখন কি হবে, দু'দিন না যেতে…।"

লুসিল সজোরে চোখ মুছতে লাগল।

বব্ অপ্রস্তুত মুখ করে বারে বারেই বলতে লাগল, "ওসব কথা ত তোমাকে বলিনি। আমাকে বলছিলাম। আমারই ত বাজার থেকে সব কেনা উচিত ছিল। আমি সব তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে ট্রেলার নিয়ে মেতে রইলাম। ডার্লিং, দোষ ত আমার।"

শেষ পর্যন্ত বিস্কুটে মাখন লাগিয়ে ও নুনহীন ডিম খেয়ে তখনকার মতো ক্ষুন্নিবৃত্তি হোল।

হিরো-হিরোইনের দুরবস্থা দেখে সারা অডিটোরিয়াম হাসিতে ফেটে পড়েছে।

এই ত দুনিয়া। কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। লুসিল ও বব্ আধপেটা খেয়ে আছে, আর সকলে হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ভাগ্যিস বেচারারা পর্দাতে। না হলে যে কি হোত ভাবা যায় না।

এদিকে সঙ্গীতা ও রিণরিণ-এর হেসে হেসে পেটে খিল ধরে গেছে।

"সু, হেসে হেসে আমার ত পেটে ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে।"

"আমারো," সঙ্গীতা বলে উঠল।

"কে জানত, এ রকম বিপত্তি হবে। না হলে সারিডন নিয়ে আসা যেত সঙ্গে করে।"

এই পরিস্থিতির কথা আগে থেকে চিন্তা করেই বোধহয় সিনেমার কর্তৃপক্ষ এখানে টানল দড়ি। চারদিকে বাতি জ্বলে উঠল। ইণ্টারভ্যাল হোল।

দুই বন্ধুতে হল থেকে বেরিয়ে এল সুসির সন্ধানে। এই নিয়মই চলে আসছে কিছুকাল ধরে। সঙ্গীতা যেখানেই যাক না কেন, সুসি যাবে সঙ্গে। ওকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে, ওকে কিছু খাইয়ে, নিজেরাও কিছু খেয়ে যে যার সিটে গিয়ে বসল।

সুসি সুসির সিটে, মানে মোটরে। সু ও রিণ হলের মধ্যে।

সিনেমার শেষে যখন সবাই বেরিয়ে এলো, সকলের মুখে হাসি। মনে হোল ক্ষণিকের জন্য হলেও পৃথিবী দুঃখশূন্য।

"এ রকম ছবি দেখতেই ভালো লাগে। তাই না?"

"তা যা বলেছিস। আমি ত বেছে বেছে এই সবই দেখতে চেষ্টা করি। অশান্তি ত চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে। কেন রে বাবা, কিছুক্ষণের জন্য তা ভুলব না?"

রিণরিণ গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, "তোর আবার কিসের দুঃখ ?"

"কিছু নেই, তাই বুঝি ?"

"বাদ দে এখন। ভীষণ হাসি পাচ্ছে, যা দেখেছি সেইসব সিনগুলো মনে পড়ে, হা, হা, হা।"

"তুই থাম ত। আমার বুঝি হাসি পেতে নেই ? হাতে হুইল, অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।"

"ঠিক কথা। এই চুপ করলাম··· ।"

সুসি এদের কাণ্ডকারখানা দেখে ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়ছিল। এখন শান্ত হয়ে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

॥ দুই ॥

রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজ বেরিয়েছেন তাঁর প্রাতঃভ্রমণে।

একে ঠিক প্রাতঃভ্রমণ বলা চলে না। এ হচ্ছে সেই মোহময় সময় যখন রূপালি রজনী তার ঘোমটা পুরোপুরি চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেয় নি। এটা হোল আঁধার-আলোর মিলনক্ষণ। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সলজ্জ চাহনি আর সেই ফাঁকে দিনের আলো তার দয়িতার মুখ থেকে আবরণ উন্মোচনে অধীর।

এই আলো-আঁধারের মিলনের মধুর ক্ষণ হচ্ছে স্বামীজীর বড় প্রিয়। তখন তিনি ধ্যানে বসেন। না হলে বেরিয়ে পড়েন নিতলনীল নীরবতার মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিতে।

এই সময়টাই হচ্ছে তাঁর নিজস্ব।

সারা দিনের ঝামেলার ত অন্ত নেই। অত বড় একটা ইনস্টিটিউশন চালানো ত সোজা কথা নয়। কত রকম সমস্যা। ভালো মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর। তাছাড়া ভক্তের ভিড় ত লেগেই আছে। নরনারায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণও তাই বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও সেই একই কথা উচ্চারণ করেছেন। 'জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

তাই কাউকে ত বিমুখ করতে পারেন না। তাঁরও ত নিজের পাথেয় চাই।

তাই মহারাজ এই সময়টা বেছে নিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব হিসাবে। রাস্তাঘাট নির্জন। গৃহস্থরা সকলেই ঘুমে নিঝুম।

তিনি চলেছেন একটা নির্জনের মধ্যেও নির্জন রাস্তার ধার ঘেঁষে। এই রাস্তাটি তাঁর বড় প্রিয়।

তিনি এই রাস্তা দিয়ে বলতে গেলে রোজই ঠিক এই আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে হাঁটতে বের হন।

মনটা আনন্দে ভরপুর। সবকিছু বড় আপন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে নিজেকে সবার মাঝে বিলিয়ে দিই। সবকিছুর মধ্যে, বিশ্ব-চরাচরে।

হঠাৎ পায়ে যেন কি ঠেকল। থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন পথের ধারে শিশু। সুন্দর করে কাপড়-জামা চাপা দিয়ে কে যেন তাকে ফেলে গেছে। উনি ভালো করে দেখলেন। এদিক ওদিক তাকালেন। নাঃ, ধারে-কাছে ত কেউ নেই।

এটা বুঝলেন, যেই রেখে গিয়ে থাকুক, বড় যত্ন করে, বড় স্নেহের সঙ্গে ফেলে গেছে। ঘুম পাড়িয়ে, কাপড় চাপা দিয়ে। পাশে একটা ছোট পুঁটুলি। তাতে দেখলেন কিছু জামা, একটা বাটি, ঝিনুক ও অতি ছোট একটা দুধের টিন।

বাচ্চাটা ক'দিনের তা উনি ঠিক বুঝতে পারলেন না। পনের দিনেরও হতে পারে, এক মাসেরও হতে পারে।

তাঁর মনে হোল, তাঁর হাতেই দেবার জন্য বোধহয় এই সময় এইখানে রেখে গেছে। উপায়হীনভাবেই যে ফেলে গেছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কত যত্ন করে, যতটা সম্ভব গুছিয়ে, সঙ্গে জিনিস দিয়ে।

উনি এদিক-ওদিক তাকালেন যদি কাউকে দেখতে পান। না। কারও চিহ্ন নেই। এদিকে দিনের আলো একটু একটু করে রাত্রিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছে। একটা কিছু ত করতে হবে। আশ্রমে নিয়ে গেলে একে অনাথ আশ্রমে পাঠাবার বন্দোবস্ত হবে।

দেবশিশুর মতো মুখের দিকে তাকিয়ে এই ব্যবস্থাটা যেন তাঁর মনঃপূত হোল না।

'তাই ত, কি করা যায়? সাধারণ নিয়ম অনুসারে ত পুলিসে খবর দেওয়া উচিত। কিন্তু তা হলে যে অভাগিনী জননী একে ত্যাগ করে গেছে তার খোঁজ পেলে তাকে সারা জীবন দুর্নাম বইতে হবে। যদি খোঁজ না পাওয়া যায়, এই নিষ্পাপ শিশু সারা জীবন অবৈধ অনাথ বলে ছাপ বয়ে বেঁচে থাকবে।'

'এই পবিত্র ভোরবেলাতেই কি এই পরিণতির জন্য এই শিশুকে আমার সামনে ধরেছ, প্রভু?'

'হে প্রভু, বুদ্ধি দাও, পথ দেখাও।'

ওঁর প্রার্থনা যেন তাঁর গুরুর কানে গেল। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল একটা নাম। মিসেস সারথির কথা। ওঁব শিষ্যা। সত্যিকারের শিষ্যা।

থাকেন ছোট এক ঘরের একটা ফ্ল্যাটে। টাউনের বাইরে। প্রতিদিন তাঁর কাছে আসেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সত্যিকারের ধর্মভীরু। দু'জনেই তাঁর শিষ্য।

স্বামী কিছুদিন হোল মারা গেছেন।

আপনজন, মানে সত্যিকারের আপনজন বলতে দু'কুলেই কেউ নেই। দরকার-অদরকারে আশ্রম থেকেই ওকে দেখাশুনা করা হয়। মহারাজের বড় অনুগত। মধ্যবয়সী, নিঃসন্তান।

স্বামীর ইনসিওরেন্সের টাকা খাটিয়ে যা পায়, তাতেই চলে যায়। সাদাসিধে জীবনযাত্রা। তাছাড়া, সারাদিন ত এসে আশ্রমেই পড়ে থাকে। রাতে শুধু নিজের আস্তানায় ফিরে যায়।

হঠাৎ শ্রীমতী সারথির কথা তাঁর মনে হোল। ছেলেমেয়ে নেই। তাছাড়া ওঁর বড় ভক্ত। যা বলবেন, তাই করবে।

বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন। আহা, অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বেচারা তার ভাগ্যের পরিবর্তনের কথা কিছুই জানল না। কত নির্ভরশীল।

তখনই স্বামীজীর মনে হলো, ঠিক এই দেবশিশুর মতো আমরাও যদি এই রকম নির্ভরশীল হতে পারতাম, তবে উনিও ঠিক এইভাবে আমাদের সবকিছু থেকে আড়াল করে রাখতেন।

আমরা সাধারণ মানুষ তা পারি না বলেই এত দুর্দিনের, দুর্দশার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

এত ভোরে ট্যাক্সিও ত পাওয়া যাবে না। ঠিক এই যখন ভাবছেন, সেই মুহূর্তে দূরে দেখতে পেলেন একটা ট্যাক্সি আসছে। স্বামীজী ততক্ষণে মনে মনে সব ঠিক করে ফেলেছেন। গাড়িতে উঠেই শ্রীমতী সারথির ঠিকানা বলে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই শ্রীমতী সারথির বাড়ির কলিং বেল বেজে উঠল। সারদা দেবীর তখন ঘুমটা ভেঙেছে। উঠি উঠি করেও তখনও বিছানা ছাড়েন নি। একা মানুষ। বাড়ির যাবতীয় কাজ নিজেই করেন।

সকালে রান্না করে রেখেই সারাদিনের জন্য আশ্রমে চলে যান। ওখানেই প্রসাদ পান। কিছু কাজ করেন। বক্তৃতা শোনেন। মহারাজ যা আদেশ দেন, তাই পালন করেন। রাতে নিজের আস্তানায় ফিরে আসেন।

স্বামী মারা যাবার পর এই তাঁর রোজকার রুটিন। অসুখ-বিসুখ হলে আশ্রম থেকে স্বামীজীরাই সব দেখাশোনা করেন।

"এত ভোরে কে আবার বেল টিপল," নিজের অজান্তেই কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দরজা খুলে ত একেবারে যাকে বলে হতবাক্‌। মহারাজ নিজে তার দ্বারে।

আনন্দে তার মন ভরে গেল। সে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। হাতে কি ধরে আছেন সেদিকে খেয়ালও করল না।

"সারদা, দরজাটা বন্ধ কর। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

দরজা বন্ধ করে এসে তখন সারদাদেবীর দৃষ্টি পড়ল মেয়েটার দিকে।

"এ কে মহারাজ? কার মেয়ে? কোথায় পেলেন?"

"এ সবই যদি জানব, তবে তোমার কাছে ছুটে আসব কেন? আমি যা বলব, সে কথা তুমি মানবে? কখনও যেন কেউ কিছু জানতে না পারে।"

"মহারাজ, আপনাকে আমি ত আমার ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে মনে করেছি আর করব। মরণ পর্যন্ত আপনার যে কোন কথা আমার শিরোধার্য।"

"বেশ, তবে শোন। রাস্তায় একে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি সকালে হাঁটতে বেরিয়ে। আশ্রমে নিয়ে গেলে একে অনাথ আশ্রমে পাঠাবার বন্দোবস্ত হোত। ভালোই থাকত।

"তবুও জান, কেমন মায়া হোল। মনে হোল এই নিষ্পাপ শিশুকে যদি মায়ের কোলে তুলে দিতে পারতাম, আর সে এই শিশুকে নিয়ে যদি সসম্মানে জীবনযাপন করতে পারত! জান সারদা, আমাদের ধর্মে যে জন্ম দেয় সে যেমন মা, ঠিক সেই রকমই যে পালন করে সেও সেই রকম মা।"

স্বামীজী একটু থামলেন। ততক্ষণে সারদার বাচ্চাটির মুখের দিকে ভালো করে দেখবার সুযোগ হয়েছে। নিঃসন্তান মাতৃহৃদয় যেন কেমন করে উঠেছে। আস্তে আস্তে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল মহারাজের দিকে।

স্বামীজী তার কোলে শিশুটিকে দিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তা জলে ভরে গেছে। মাতৃস্নেহ সারা মুখে ছেয়ে গেছে।

উনি ধীরে ধীরে বললেন, "সারদা, আমি এটাই ভেবেছিলাম। তোমার জন্যই ভগবান একে আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। এখন মন দিয়ে আমার কথা শোন। একে কখনও জানতে দেওয়া হবে না যে, এ পরিত্যক্তা, পরিচয়হীনা। শুধু তাই নয়। আমি ও তুমি ছাড়া ছুনিয়াতে কেউ জানবে না। পার তুমি এমন কোন ব্যবস্থা করতে, যাতে সমাজের কোন লোকসান হবে না, আইন নিয়ে মুশকিল হবে না, অথচ এই নিষ্পাপ শিশু স্বাভাবিক ভাবে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবে?"

সারদা ভাবতে লাগলেন।

স্বামীজী বললেন, "তোমার মাতৃ-হৃদয়ই তোমায় বলে দেবে এ অবস্থায় সংসারে কি করা সম্ভব।"

"আমি ট্রেনে করে একে নিয়ে যে-কোন একটা দূরের ছোট জায়গাতে চলে যাব যেখানে আমাকে কেউ চেনে না।"

"তারপর?"

"তারপর তু'দিন পরে এসে বলব, আমার এক অতি দূরসম্পর্কের বিধবা জা খুব অসুস্থ হয়ে আমাকে টেলি পাঠায়। তাই হঠাৎ আমি চলে যাই। যাবার পর আমার এই দূরসম্পর্কের আত্মীয়া মেয়েটা রেখে মারা যায়।"

"অবশ্য যদি এই শিশুর মা প্রমাণ পরিচয় দিয়ে কোনদিন সসম্মানে একে নিয়ে যেতে চায়, সে পথও খোলা থাকবে। ততদিন আমার পদবীই হবে ওর পদবী আর আমি কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে যে নিঃসন্তান আমি আজ থেকে সন্তানবতী হলাম আপনার কৃপায়।"

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমি বড় হাল্কা বোধ করছি।"

মহারাজ এতক্ষণ পরে একটা চেয়ারে বসলেন।

"তোমার কাছে টাকা আছে?"

"আমার কাছে যা আছে তাতে হয়ে যাবে।"

"আর তবে দেরী কোর না। নীচে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। সকলে উঠবার আগেই বেরিয়ে পড়।"

দরজায় তালা দিয়ে তাড়াতাড়ি ওঁরা বেরিয়ে এলেন।

ভগবানের কি অশেষ কৃপা। শিশু তখনও ঘুমে আচ্ছন্ন। ট্যাক্সি চলে গেল স্টেশনের দিকে।

মহারাজ ধীরে ধীরে ফিরে চললেন আশ্রমের দিকে।

॥ তিন ॥

সঙ্গীতা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে।

জীবনে ঝড়-ঝাপ্টা কিছু দেখে নি।

কৃতী ব্যারিস্টার সাহেবের একটি কন্যারত্ন। দুটি ভাই অবশ্য আছে। বড় ও ছোট। চিরকাল কলকাতায় মানুষ।

ছুটি-ছাটাতে অবশ্য ভারতবর্ষের চারদিকে বাবা-মা'র সঙ্গে ঘুরেছে যথেষ্ট। ভারতবর্ষের বাইরেও গিয়েছে। পশ্চিমের দেশও তার অজানা নয়।

মানুষ হয়েছে কিছুটা পশ্চিমী ধাঁচে; আবার কিছুটা সনাতনীভাবে।

ঠাকুমা-ঠাকুরদা যতদিন বেঁচে ছিলেন বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব হোত।

ঠাকুরও যেমন একদিকে থাকত, আর একদিকে বেয়ারা-বাবুর্চিও।

রোস্ট-স্টুর সঙ্গে সঙ্গে শুক্তো-চচ্চরির মিলটা বেশ চোখে পড়বার মত।

মিস্টার ও মিসেস্ চৌধুরী দু'নৌকায় পা দিয়ে ভালোই চালাচ্ছিলেন। ছেলেমেয়েরাও সেইজন্য ঠাকুরঘরেও যেমন প্রণাম করত, তেমনি তর-তর করে ইংরেজীও বলত। যাকে বলে পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয়।

দু'দিকেরই ভালোগুলো যেন বেছে নেবার চেষ্টা।

এই বাড়িতে বাংলাভাষার চর্চা খুব বেশী ছিল। আইনের বইয়ের

যেমন বড় লাইব্রেরী ছিল, ততটা বড় না হলেও বাংলা বইও বড় কম ছিল না। তাই কলকাতার অভিজাত ও কালচার্ড শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে এই পরিবারটার বেশ একটা বিশেষ স্থান ছিল।

এত সচ্ছলতার মধ্যেও এঁদের মনে অহংকার বলে কিছু ছিল না। সবার জন্যই ছিল অবারিত দ্বার। আদর আপ্যায়ন সকলের জন্যই। ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়।

তাই ছেলে-মেয়েরাও বড় ভালো হয়েছিল। মিস্টার চৌধুরীর বাবা-মা গত হয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁদের উপদেশ একদিনের জন্যও ভোলেন নি।

"ভগবান দু'হাত তুলে সব দিয়েছেন—সেই কথাটা সব সময় মনে রাখবে। তাঁর দয়ার অমর্যাদা কোর না। কাউকে মনে ব্যথা দিও না। কাউকে বিমুখ কোর না।"

এই কথাগুলো দু'জনে মেনে চলেন।

মা'র শেষ কথা—"নাতিকে বিলাতে পাঠাস পড়তে, কিন্তু সঙ্গীতাকে সময়ে বিয়ে দিস। এ বাড়ির মেয়েকে রোজগার করে খেতে হবে না। তাই বিয়ের পরে যদি স্বামীর সঙ্গে যায় ও কিছু পড়ে তাতে বাধা নেই।"

ছেলেকে যেমন ব্যারিস্টারী পড়তে পাঠিয়েছেন, মেয়েকেও পাঠাবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু মা'র শেষ ইচ্ছা তিনি ঠেলাতে পারেন নি। তাই সঙ্গীতা সিনিয়ার কেমব্রিজ পাশ করেছে। গ্র্যাজুয়েট হবার পর এম. এ. পড়ছে।

চৌধুরী সাহেবের বন্ধুর ছেলে বোধিসত্ত্ব সিন্‌হার সঙ্গে সঙ্গীতার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। কয়েক মাস পরে বিয়ে হবে। বড় ছেলে বিলেত থেকে ফিরলেই।

বাবা-মারাই প্রথম ঠিক করে। পরে অবশ্য ছেলে-মেয়েতে দেখা-শোনা যথেষ্ট হয়। দু'জনের দু'জনকে ভালো লেগেছে, বলতে গেলে ভালোই বেসেছে।

তাই এই বিয়ের এটাই অভিনবত্ব। চারজনেই ঠিক করেছে বলা যায়। আবার দু'জনেও ঠিক করেছে বলা যায়।

রিণরিণ ও সঙ্গীতা একসঙ্গে পড়েছে। স্কুলের সবক'টি বছর না হলেও অনেক ক'টা বছরই একসঙ্গে পড়েছে। পরে বেশ কয়েক বছরের জন্য হয়েছিল ছাড়াছাড়ি। ওপর দিকে উঠে রিণরিণ ভর্তি হয় আর্ট স্কুলে। তাঁর আঁকবার প্রতিভা দেখে কনভেন্টের মাদার সুপিরিয়ারই চেষ্টা করে তাকে ভর্তি করেছেন। তাঁর চেষ্টাতেই স্কুল থেকে ভালো রেজাল্ট করে বের হবার পর একটা ফরেন স্কলারশীপ যোগাড় করে দেন, প্যারিসে গিয়ে অঙ্কনশিল্প শিখবার জন্য।

সঙ্গীতা দেশে থেকে গেলেও ওদের বন্ধুত্ব থেকে যায় অটুট। প্রতি সপ্তাহে দু'জন দু'জনকে সব কথা না জানিয়ে যেন শান্তি পেতো না।

তাই বোধিসত্ত্ব মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলত, "তোমার বন্ধু রিণরিণ না হয়ে রণবীর হলে আমার নিশ্চয়ই কোন চান্স হোত না।"

মাথা দুলিয়ে সঙ্গীতা উত্তর দিয়েছে, "তা আর বলতে!"

সঙ্গীতা রিণরিণকে এত ভালোবাসে, কিন্তু তবুও কেমন যেন ওর এক এক সময় মনে হয় রিণরিণের কোথায় যেন একটা বড় ক্ষত আছে যা সে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে।

এক এক সময় মনে হয় সে যেন সম্পূর্ণ ওকে চেনে না। অনেকটাই তার অজানা। ওর মধ্যে যেন দুটি সত্তা আছে। একটি জানা আর একটি অজানা।

আবার মনে হয়, এত প্রাণখোলা মেয়ে, আর ওই ত বলতে গেলে তার প্রাণের বন্ধু। এই ধারণাটা তার নিতান্তই মনগড়া।

রিণরিণের মা অমৃতা রাও কনভেন্টে অনেক দিন থেকে টিচার। রিণরিণকে খুব ছোট নিয়ে উনি বিধবা হন। মাদ্রাজী মেয়ে মাদ্রাজেই থাকতেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর কলকাতায় চলে আসেন ও কাজ আরম্ভ করেন। মিস্টার ও মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে মিসেস্ রাও-এর খুব ভাব। প্রায় বাড়ির লোকের মতো। মেয়েদের থেকেই এর সূচনা।

স্বামীর কথা উঠলেই মিসেস রাও যেন কেমন হয়ে যান। তাই কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। অমৃতার মনে ব্যথা কেউ দিতে চায় না। এত শান্ত ধর্মভীরু মহিলা বড় একটা চোখে পড়ে না। জোরে কথা বলতে পারেন না। কম কথা বলেন। যাকে বলে মিষ্টি-মধুর।

বয়স মাঝারী হলে কি হবে, এখনও রূপ যেন ধরে না। মনে হয় রিণরিণের দিদি। অল্প বয়সের সুন্দরী বিধবা। কত লোকের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বড় বড় শান্ত চোখ তুলে যখন চেয়েছেন, ছেলেদের মুখের কথা মনেই রয়ে গেছে।

মনে হয়েছে এ ত মানবী নয়, এ ত দেবী। একে দূর থেকে আরাধনা করা যায়, কিন্তু কাছে টানা যায় না।

রিণরিণ ঠিক উল্টো। জীবন্ত, চঞ্চল। মার মতো অত সুন্দর না হলেও যাকে বলে চার্মিং।

মানুষকে আরো আকর্ষণ করে তার স্বভাব। প্রাণখোলা হাসি। অফুরন্ত কথা। নিমেষে মানুষকে কাছে টেনে নিতে পারে।

ও যেন অন্য দিকে একটা মিস্ত্রী। কাছে যেমন টেনে নিতে পারে দূরে ঠেলে দিতেও তার সময় লাগে না।

প্যারিসে কত ছেলে তার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে। তার উপর আবার শিল্পীদের নিয়ে কাজ, যাকে বলে ভাবের রাজ্যে ভাবুকদের নিয়ে কারবার।

তার মধ্যেও রিণরিণের মনের মধ্যে কেউ ছাপ ফেলতে পারে নি। কিছুটা এগোলেই মিষ্টি হাল্কাভাবে সে পথ দেখিয়ে দিয়েছে—'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা। অন্য কোন খানে।'

॥ চার ॥

মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজ বেশ কয়েক বৎসর হ'ল এই আশ্রমের অধিকর্তা।

শুধু ধর্মভীরু হলে বোধহয় মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এতটা পেতেন না। তিনি বড় দয়ালু। কারও মনের দুঃখ জানতে পারলে ছুটে নিজে গিয়ে সেখানে দাঁড়ান। তিনি যে শুধু আর্তের সেবা করেন, খাওয়ার অভাব, চিকিৎসার অভাব, মানে শুধু পার্থিব অভাবের দিকটাই পূরণ করেন, তা নয়। তার চাইতেও উপরে হচ্ছে মনের শান্তির অভাব। তা পূরণ করতে চেষ্টা করেন।

শাস্ত্রীয় দু'চারটি শুকনো উপদেশ দিয়ে বা কর্তব্য-অকর্তব্যের কথা শুনিয়ে তাঁর কাজ শেষ হয় না।

তিনি চেষ্টা করেন প্রতিটি মানুষের অন্তস্তলে পৌঁছতে। মুখ ফুটে না বললেও তিনি কেমন যেন তাঁর তৃতীয় শক্তি দিয়ে তা বুঝে সেইভাবে তাকে বুঝিয়ে শান্তি দিতে চেষ্টা করতেন।

তাঁর কাছে পাপ পুণ্য বড় ছিল না। জীবে শান্তি সুখ দেওয়াটাই ছিল বড় ধর্ম। তাই কত সহজে তিনি এই বাচ্চাটির মঙ্গলের জন্য নির্দোষ ছলনার আশ্রয় নিতে দ্বিধা বোধ করলেন না।

তাঁর কাছে সবাইকে রক্ষা করাটাই ছিল সব চাইতে বড় সেবা।

"মহারাজ, দু'দিন যাবৎ আপনাকে বড় ক্লান্ত ও চিন্তিত দেখছি। শরীর আপনার ভালো আছে ত?" জিজ্ঞাসা করল এক ব্রহ্মচারী।

দু'দিন যাবৎ সকলেরই মনে হচ্ছে মহারাজ যেন কি চিন্তা করছেন। একটু চঞ্চল মনে হচ্ছে।

"না, না। তেমন কিছু নয়। আমি ভালোই আছি।"

মহারাজ নিজের কাজে মন দিলেন। তাঁর মন এক সংশয়ের মধ্যে

চলেছে। শ্রীমতী সারথিকে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিতে নিজে সায় দিলেন। তাঁর বড় স্নেহের পাত্রী এই শিষ্যা।

এত বৎসর ধরে তিনি বলেছেন, সর্বদা সত্যের পথে থাকবে। সেই তাকেই তিনি মিথ্যার পথ শিখিয়ে দিলেন! এটা কেমন হোল!

তিনি ধ্যানে বসলেন। 'হে প্রভু, হে দেব, তুমি বলে দাও, আমাকে বুঝিয়ে দাও, এই পথ যা আমি নিয়েছি, তা ঠিক কিনা!'

মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল—'জীবের সেবা মানে শুধু শুশ্রূষা নয়, ঠিক পথে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। দরকার হলে মানুষের গড়া শৃঙ্খল কাটিয়ে তাকে দাঁড়াবার শক্তি দেওয়া। খুব ঠিক কাজ করেছ।'

ধীরে ধীরে উনি চোখ খুললেন। মনটা শান্ত হয়ে এসেছে।

তাঁর গুরুর মত তিনি জেনেছেন—নিষ্পাপ শিশুটিকে সকলের চোখের সামনে পাপের চিহ্ন হিসাবে চিহ্নিত করাই হোত পাপ। তা থেকে তিনি বাঁচিয়েছেন।

শ্রীমতী সারথির মাতৃহৃদয় তিনি পূর্ণ করেছেন।

এইভাবে যে শিশুকে শ্রীমতী পালন করবেন, তাকে পূর্ণ স্নেহ ও মর্যাদা তিনি দিতে পারবেন। না হলে সর্বক্ষণ মানুষের ঘৃণার স্পর্শ থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর নিজের শান্তিও বিঘ্নিত হোত।

জন্মের চাইতেও বড় হচ্ছে কর্ম। যেখান থেকেই তার উৎপত্তি হোক, এই শিশু যখন এই রকম ধর্মপ্রাণা মায়ের হাতে এসে পড়েছে, তার মানেই হচ্ছে, এর আগের জন্মের অনেক সৎ কর্মের ফল।

সত্যিকারের মা-বাবা বোধ হয় অতি সাধারণ স্তরের লোক। তাদের সত্যিকারের বিয়ের সন্তান হয়ে জন্ম হয়ে থাকলেও আর দশটা অতি সাধারণ মেয়ের মতো বড় হোত। এমন কি খারাপ পথেও যেতে পারত। এ রকম ত হামেশাই হয়ে থাকে। এখন সে বড় হবে অন্য এক আবহাওয়ার মধ্যে।

তিনি প্রার্থনা গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন। আবার সেই শান্ত, সৌম্য, সদা হাস্যময় স্বামীজীকে সবাই দেখল।

তাই ত' দু'দিন কেটে গেছে। সারদার ত আসার সময় হয়ে এলো। ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করুন।

আশ্রমের সবাই দেখল, মহারাজ আবার আগের মতো দৈনন্দিন কাজে মন দিয়েছেন। শান্ত ললাটে যে একটা চিন্তার রেখা পড়েছিল, তা মিলিয়ে গেছে।

আরও দিন দুই পরে সারদা দেবী এসে উপস্থিত হলেন আশ্রমে। উনি রোজ আসেন। একদিন না আসার পরই একজন ব্রহ্মচারী গিয়েছিলেন তাঁর সন্ধানে। এই নিয়মই সারদা দেবী বিধবা হবার পর থেকে চলে আসছে।

"মহারাজ সারদা দেবীর সন্ধান করতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম সামনে তালা ঝুলছে। পাশাপাশি অনেককে জিজ্ঞাসা করলাম। কেউ সঠিক কিছু বলতে পারল না। কেউ কিছু জানে না কোথায় গেছেন, কি হয়েছে। এখন কি করা কর্তব্য মহারাজ ?"

"সারদা দেবী বয়স্কা মহিলা। তেমন কিছু অবস্থাপন্নও নয় যে কোন অঘটন ঘটতে পারে। দু'দিন অপেক্ষা করে দেখা যাক্। ভগবানের কৃপায় ভালো খবরই পাওয়া যাবে। ঈশ্বর মঙ্গলময়।"

সারদা দেবীকে দেখে আশ্রমের সকলেই খুশী।

"কি ব্যাপার ? হঠাৎ কোথায় গিয়েছিলেন ? আমরা ভেবে মরি। কেউ কিছু জানে না।"

"ব্যাপারটা হঠাৎই হোল। আমার এক অতি দূরসম্পর্কের জা অল্পদিন বিধবা হয়েছিল। তার কাছ থেকে এক আরজেন্ট টেলি— 'মরণাপন্ন, শীগ্‌গির এসো'। তাই কাউকে খবর দেবার সময় পাইনি।"

বেশ দুঃখের সঙ্গে তিনি বলে চললেন, "আমি ছুটে চলে গিয়েছিলাম তার কাছে। সেই হতভাগীরও আমার মতো তিনকুলে কেউ নেই।"

"এটা কি বললেন, সারদা দেবী ? আপনার জন্য আমরা ত রয়েছি। আপনি ত আমাদের গুরুবোন। একই গুরুর শিষ্য আমরা।"

"ঠিকই। আমারই বলাটা ঠিক হয় নি। যাই হোক, আমি যাবার কয়েক ঘণ্টা পরই ও মারা যায়। কিন্তু রেখে গেছে মাসখানেকের একটা ফুটফুটে মেয়ে।"

"তাকে নিয়ে এসেছেন ত ? তবে ত এখন আপনি মা জননী," সকলে বলে উঠল।

"ঠিকই তাই। নদীর এক কূল ভাঙে, আর এক কূল গড়ে। মানুষের জীবনও তাই। মা গেল মারা, আর সন্তানহীনা হোল সন্তানবতী।"

"মেয়েটার মা'র কপাল ভালো, এমন মা'র হাতে তুলে দিতে পেরেছেন। কম কথা। চল সবাই, মহারাজকে খবর দি।"

"উনি ত এখন মন্দিরে। দ্বার বন্ধ।"

"আপনারা আপনাদের নিত্যকার কাজে যান। আমিই ওঁকে সব বলব।"

"মেয়েটিকে কোথায় রেখে এলেন ?"

"পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলার কাছে। খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি।"

"আজ ত আপনি সারাদিন থাকতে পারবেন না।"

"না, আজ আর থাকা হবে না।"

ঠিক সেই সময়ে মহারাজ বেরিয়ে এলেন।

"যাক, তুমি এসেছ, সারদা। তোমার জন্য আমরা সকলে একটু চিন্তাতেই পড়েছিলাম।"

সারদা দেবী প্রণাম করে বললেন, "আশীর্বাদ করুন মহারাজ ! আপনার আশীর্বাদের বড় প্রয়োজন।"

"আমি ত সব সময়ই তোমাদের আশীর্বা[illegible] করছি," [illegible] বলতে মহারাজ নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালে[illegible]

সারদা দেবীও তাঁকে অনুসরণ করলেন। অন্যান্য সকলে যার যার নিত্যনৈমিত্তিক কাজের দিকে চলে গেলেন।

ঘরে ঢুকে মহারাজ দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

"মহারাজ, আপনার আদেশ মতই সব করেছি। আপনার আশীর্বাদ ছিল বলেই পথে কোন কষ্ট হয় নি। যে হোটেলে উঠেছিলাম—ছোট শহরের ছোট হোটেল, কিন্তু বড় যত্ন পেয়েছি। মনে হয়েছে আপনার হাতটি যেন সব সময় আমার মাথার ওপরে। এখানে এসে আপনি যা বলে দিয়েছিলেন, তাই সকলকে বলেছি, প্রভু।"

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন! বাচ্চাটিকে কোথায় রেখে এসেছ?"

"পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলার কাছে।"

"তবে ত তোমার আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা চলবে না।"

"কিন্তু মহারাজ, মেয়েটিকে পেয়ে আমার একদিক পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু আপনার সান্নিধ্য ছাড়া, এই আশ্রমকে ছাড়া যে আমার দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, মহারাজ। আমি যে দোটানায় পড়ে গেলাম। আমার একটা উপায় করে দিন।"

"ঠিক আছে সারদা। আমি ব্যবস্থা বলে দিচ্ছি। প্রথম ক'টা দিন বাচ্চাটি একটু ধাতস্থ হোক। তুমি রোজ অল্প সময়ের জন্য আসবে।"

"তারপর?"

"হ্যাঁ, তারপর বাচ্চাটিকে নিয়েই আসবে। দেখাশুনা করবে, আর আশ্রমের যে সব কাজ তুমি করতে, তাও যতটা সম্ভব করবে।"

"বাঁচালেন, মহারাজ। আমি বুঝতে পেরেছি এই আশ্রম, আপনি আমার প্রাণ। বড় দুর্ভাবনায় ছিলাম, মেয়ের জন্য এদিকটা বুঝি হারাই।"

"তা কি হয়, সারদা? এই শিশু তোমাকে বন্ধনে আবদ্ধ করবে না, মুক্তির পথেই নিয়ে যাবে।"

"আশীর্বাদ করুন, মহারাজ।"

"এর নাম আমি দিলাম অমৃতা। ওকে যত্ন কোর, সারদা। আর, আমি আর তুমি যা জানি তা যেন তৃতীয় কেউ না জানে। অমৃতাও কিছু জানবে না।"

"মহারাজ, আপনার আদেশের এদিক-ওদিক হবে না।"

"তোমার কথাই ভাবছিলাম। বাচ্চাটি ভালো ত?"

"হ্যাঁ প্রভু! ভালো আছে। কিছু জ্বালায় না। বড় শান্ত। শুধু ঘুমোয়। খাইয়ে দিলেই হোল। রাতেও ওঠে না। সবাই ওখানে দুঃখ করে বলছে, কি মেয়েই জন্ম দিয়েছিল, মা জানল না। দিদি, তোমার কপাল ভালো। মেয়েটিরও কপাল ভালো, তোমাকে পেল।"

"ঠিক কথাই ওরা বলেছে, সারদা। তোমার মতো মা পাওয়া আগের জন্মের পুণ্যের ফল না থাকলে হয় না।"

প্রণাম করে সারদা মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আশ্রমের কিছু কাজ করে সে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিল।

মনটা পড়ে রইল আশ্রমে। কিন্তু কর্তব্য। আশ্রমে না থেকেও সারদা দেবী মনে-প্রাণে হয়েছিলেন আশ্রমবাসিনী। তাই এত তাড়াতাড়ি ঘরে যেতে যেন মন চাইছিল না।

এইভাবে ক'দিন কাটার পর মহারাজ আশ্রমবাসীদের সবাইকে সারদা দেবীকে যে আদেশ তিনি দিয়েছেন, সেই কথা জানিয়ে দিলেন।

"ঠিক আদেশ দিয়েছেন। সারদা দেবী ত আশ্রমের অংশ হয়ে পড়েছেন। তাঁর না থাকাতে কিছু কিছু কাজে বিশৃঙ্খলা একটু হচ্ছে বৈকি।"

"আমি বলেছি মেয়েটিকে নিয়ে আসতে। আবার বিকেল নাগাদ মেয়েটিকে নিয়ে চলে যাবে। তোমরা কেউ যাবার সময় একটু সঙ্গে যেও।"

"নিশ্চয়ই কেউ না কেউ যাবে।"

"আসার সময় খুব ভোরে আসতে বলেছি। তাই কোন অসুবিধা হবে না।" মহারাজ থামলেন।

"মেয়েটির নাম দিয়েছি অমৃতা।"

"ভারী সুন্দর নাম দিয়েছেন, মহারাজ। আপনার আশীর্বাদে সবার মাঝে ও অমৃত ছড়িয়ে যাবে।"

মহারাজ শুধু একটু হাসলেন। মুখে কিছু বললেন না।

॥ পাঁচ ॥

কিছুদিন পর থেকে সারদা দেবীর জীবনযাত্রা দু' নৌকোতে পা রেখেই বেশ ভালোভাবে চলতে লাগল। সকালে অমৃতাকে নিয়ে আশ্রমে চলে আসতেন। ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাবতীয় কাজ করতেন।

মহারাজের ঘর নিজের হাতে না গোছালে শান্তি পেতেন না। এই রকম খুঁটিনাটি নানা কাজ। সমাজ কল্যাণের অনেক কাজেই তাঁর কল্যাণ হস্ত পড়ত।

আগে আশ্রমের বাইরেও আশ্রমের কাজের জন্য যেতে হোত বা যেতেন। এখন সেখানে পড়ল ছেদ।

শান্ত লক্ষ্মী মেয়েটি এইভাবেই বড় হয়ে উঠতে লাগল। মাঝে-মধ্যে মেয়ের অসুখ, কি কোন কারণে আশ্রমে আসার বিঘ্ন ঘটলেও তা বেশী দিনের জন্য হোত না।

মহারাজের আশীর্বাদে অমৃতা বড় হয়ে উঠতে লাগল আর দশটা বাচ্চার চাইতে কম ভুগে।

এখানে যারা থাকে, তারা সংসারের বাইরের বলেই বোধ হয় কারও নজরে পড়ে নি। মেয়েটার ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া মানে বড় হওয়া।

হঠাৎ যেন সবাই দেখল অমৃতা একটু একটু হাঁটতে পারে,

মহারাজকে আধো আধো কথায় 'মহায়াজ' বলে। আবার মাটিতে বসে পড়ে খুদে খুদে হাত দিয়ে মা'র দেখাদেখি প্রণাম করে।

"একি! এ যে বড় হয়ে উঠল।"

মহারাজ হেসে সবাইকে বললেন, "তোমরা কি আশা করেছিলে চিরকাল ও বাচ্চাই থাকবে আর তোমরা কোলে করে আদর করবে?"

সারদা দেবী নিজের ভাষা জানবেন, সেটা ত স্বাভাবিক, কিন্তু বাংলাও উনি ও ওঁর স্বামী এত ভালো শিখেছিলেন যে অবাঙালীয় একটা টান ছাড়া কেউই ধরতে পারত না উনি বাংলা ভাষাভাষী নন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত তাঁর নিজস্ব ভাষায় পড়বার জন্যই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অতি যত্নের সঙ্গে বাংলা ভাষা শিখেছিলেন।

তা ছাড়া নিজেদের গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর মাতৃভাষায় কথা বলার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হওয়াও ছিল এই ভাষা শিখবার পিছনে একটা বড় প্রয়াস।

অমৃতাও তার মা'র কাছ থেকে তামিল ও বাংলা একই সঙ্গে শিখতে লাগল।

মেয়েটি যেন আর দশটা মেয়ের চাইতে কেমন ভিন্ন স্বভাবের হতে লাগল। পুতুলখেলার চাইতে মা'র সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট ছোট হাত দিয়ে মন্দিরের কাজ করতে অনেক বেশী ভালোবাসত।

এইভাবেই অমৃতার জীবনের শুরু।

সারদা দেবীর মাতৃস্নেহে ও মহারাজের আশীর্বাদ ও উপদেশের ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠতে লাগল। চেহারা ও স্বভাব, দুটোই সব থেকে মনে করিয়ে দিত আলোকপুরী থেকে হঠাৎ খসে পড়া একটি তারা।

মহারাজই একদিন বললেন, "সারদা, তোমার মেয়ে যে বড় হয়ে উঠল।"

"আপনার দয়া।"

"এখন ত ওকে স্কুলে দেওয়া দরকার।"

"আপনি যা বলবেন, তাই হবে।"

মহারাজের পরামর্শেই আশ্রম থেকে বেশী দূরে নয় এমনি একটি মিশনারী স্কুলে তাকে ভর্তি করে দিলেন সারদা দেবী।

দিন কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। অমৃতা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল।

ক্লাসের পর ক্লাস পেরিয়ে যেমন সে এগুতে লাগল, তেমনি যৌবনের সাড়া তার শরীরে পড়ল ছড়িয়ে। দেখতে সত্যিই চোখে পড়ার মতো সুন্দরী হয়ে উঠল।

মহারাজ ঠাট্টা করে সারদা দেবীকে বলতেন, "কি মেয়েই তোমার সারদা। এ যে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।"

সারদার চোখ দুটো জলে ভরে উঠত, "সবই আপনার দয়া।"

নিভৃতে গুরু-শিষ্যে যখন গল্প হোত অমৃতা অনেকখানি জুড়ে থাকত তাঁদের কথার মধ্যে।

এদিকে সারদা দেবীর শরীর ভাঙতে শুরু করেছে। জীবনের যা ধর্ম তা ত কেউ রুখতে পারে না।

সংসারের কাজকর্ম এখন অমৃতাই করে স্কুলে যাবার আগে। কিন্তু আশ্রমের কাজ মেয়ের শত নিষেধ না মেনে তিনি করে চলেন।

"আম্মি, তুমি কেন এত খাট ? আমি রাত থাকতে উঠে এদিক-ওদিক সব করব। তারপর স্কুলে যাব। তুমি শুধু আশ্রমে বসে থাকবে। তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নেই, মা।" বলতে বলতে বড় বড় দুটি চোখ জলে ভরে আসত।

"ছিঃ, অমন কথা মুখে আনবি না। মাথার উপরে ঈশ্বর আর চোখের সামনে মহারাজ। আমরা ত নিমিত্ত মাত্র। তাঁর কৃপা তুই পেয়েছিস। তোর কিসের ভাবনা ?

এক একদিন মাকে জড়িয়ে ধরে মেয়ে বলত, "তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।"

মহারাজকে গিয়ে অমৃতা বলত, "মহারাজ, তুমি মাকে ভালো রেখো।"

"ঈশ্বরই তোমার মা'র বা আমাদের সবার মঙ্গল করবেন। তিনি মঙ্গলময়। কিন্তু একটা কথা সব সময় মনে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে, সংসারে জন্ম নিলে সাংসারিক সব কিছুর মধ্য দিয়েই যেতে হবে। সুখ দুঃখ, মিলন বিচ্ছেদ, শান্তি অশান্তি—সবই শান্ত মনে নিতে হবে। সবই তাঁর লীলা।"

এই রকম নানা উপদেশের মধ্যে অমৃতার মন স্থির হয়ে আসত।

তবুও এক এক সময় কেমন যেন মনে হোত তার অবস্থা ত আর দশজনের মতো নয়। আর যে-সব মেয়েরা তার সঙ্গে পড়ে, তাদের শুধ্ যে মা-বাবা আছে তা নয়, ভাই-বোন, আরও এদিক-সেদিক কত। বড় হয়ে সে মা'র কাছে শুনেছে, তার জন্ম হবার আগেই তার বাবা মারা গেছে। খুব ছোট রেখে জন্মদাত্রী মাও এই পৃথিবীব মায়া কাটিয়েছে।

এ-সব গল্প তার কাছে গল্পই। এ-সব তার মনে দাগ কাটে না। এই মা'কেই সে মা বলে জেনেছে। তার এই মা'ই হচ্ছে তার পৃথিবী।

তাই মাঝে মাঝে মনে ভয় হয় অমৃতার। সে নিশ্চয়ই বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। কে জানে, তার মন্দ ভাগ্য যদি এই মা'কে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

ঘুমের মধ্যে সে সারদা-মা'কে প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরে।

"কিরে? কি হোল? কিছু খারাপ স্বপ্ন দেখলি নাকি?"

"না, কিছু না। তুমি ভালো থাক মা।"

"পাগলী কোথাকার!"

মনে মনে সারদা দেবী বুঝতে পারছিলেন, তাঁর শরীরটা ভেঙে পড়ছে। আশ্রম থেকে চিকিৎসারও চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। সারদা দেবীর মনটা একদিকে আনন্দে ভরে উঠত। তাঁর বড়

ভালোবাসার স্বামীর কাছে যাবেন। আবার আর একদিকে পিছুটান অমৃতা।

তাকে ছেড়ে যেতে হবে ভাবলে মনের ভিতরটা কেমন করে উঠত।

একদিন মহারাজকে সারদা দেবী মনের কথা বললেন, "মহারাজ, আমার যদি কিছু হয়, অমৃতাকে আপনি দেখবেন।"

হেসে মহারাজ বলেছিলেন, "যিনি দেখবার, তিনিই দেখবেন। মনে পড়ে সারদা, সেই ঘটনাটির কথা? আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে তোমার হাতে ওকে দিয়েছিলাম। সেদিন কে দেখেছিল? আমি? না, তুমি? আমরা ত নিমিত্ত মাত্র। যাঁর কাজ তিনি করবেন। মন শাস্ত রাখ, স্থির রাখ।"

"ঠিক বলেছেন মহারাজ। আমরা সংসারের জীব, তাই মাঝে মাঝে ভুলে যাই। তাই ত মনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সব কিছু আপনার কাছে বলি।"

শাস্ত মনে সারদা দেবী বেরিয়ে আসেন মহারাজের ঘর থেকে।

এইভাবে দিনগুলো গড়িয়ে যাচ্ছিল। একদিন অমৃতা ভালো ভাবে সিনিয়ার কেমব্রিজ পাশ করে মা ও স্বামীজীকে এসে প্রণাম করল। সেদিন আশ্রমের সকলেরই কত আনন্দ।

অমৃতাকে সত্যিই মনে হোত আশ্রমদুহিতা। সকলের স্নেহ-মমতার ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। যেন কণ্বমুনির আশ্রমের শকুন্তলার মতো।

তফাৎ অবশ্য স্বভাবের দিক দিয়ে অনেকটাই। আর সব মেয়ের মতো যৌবনে যে একটা বিশেষ মনের পরিবর্তন বা আকাঙ্ক্ষা আসে, সেটা অমৃতার একেবারেই ছিল না।

সে যেন সন্ন্যাসীদের মাঝখানে ছোট একটি সন্ন্যাসিনীই হয়ে গিয়েছিল। মা'ও ত সংসারে থেকেও সংসারী ছিলেন না। মনটাতে তাঁর গেরুয়া রং-এর ছোপ পড়েছিল।

বাইরে অবশ্য সারদা দেবীর আকাঙ্ক্ষা মতো আর সকলের মতই অমৃতা সাজগোজ করে বেড়াত।

বড় সুন্দর হয়ে উঠেছিল অমৃতা। সামান্য সাজেই তাকে দেখাত রাজেন্দ্রাণীর মতো। পথে-ঘাটে ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে তার দিকে দেখত। কিন্তু তার শান্ত স্নিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে কেউ এগুতে সাহস পেত না। হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হোল।

অমৃতা তখন বি. এ. পড়ে। সারদা দেবী একদিন মন্দিরে প্রার্থনা করতে করতেই দেহ রাখলেন।

অমৃতাকে কলেজ থেকে নিয়ে আসবার জন্য একজন ব্রহ্মচারী আশ্রম থেকে ছুটে গেল। মাকে শোয়া অবস্থায় দেখেই, মাকে জড়িয়ে ধরে একটা চিৎকার করে সেই যে অজ্ঞান হয়ে গেল অমৃতা, তারপর আর ও কিছু জানে না। যখন জ্ঞান ফিরে আসল, তখন দেখল মহারাজ তার মাথার ওপর হাত রেখে বসে আছেন।

মহারাজের মুখের দিকে তাকিয়ে অমৃতা যেন কেমন শান্ত হয়ে গেল।

"মা, তোমার এখন অনেক কাজ। তুমি তাঁর শেষ কাজ করবে। সবই সবাই করেছে। এখন তোমার কর্তব্য তুমি কর। সারদা তোমার ওপরে তার কর্তব্যের একটুকু ত্রুটি করে নি। তুমিও করবে না, আমি জানি। তোমার মা পুণ্যবতী, তাই ঈশ্বরের নাম করতে করতে তাঁর কাছে চলে গেছেন। এই ভাগ্য ক'জনের হয়? যিনি সারদাকে দেখেছেন, তিনিই তোমাকে দেখবেন।"

অমৃতা আস্তে আস্তে উঠে তার করণীয় সব কিছু একটার পর একটা করে গেল। স্থির শান্তভাবে।

ক'দিন পরে মহারাজ বললেন, "অমৃতা, তোমার ত আর একা সেই ফ্ল্যাটে থাকা চলে না। তাই কলেজের বোর্ডিংয়েই তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তোমার আর্থিক কোন কষ্ট হবে না। সারদা সবই তোমার জন্য লিখে রেখে গেছে। মেয়েদের কলেজের হোস্টেল, কোন অসুবিধা হবে না তোমার।"

"কিন্তু মহারাজ, সকালে উঠে আশ্রমের যেসব কাজ মা'র সঙ্গে সঙ্গে করে আমি স্কুলে বা কলেজে যেতাম, তার থেকে বঞ্চিত হলে আমার পক্ষে চলা শক্ত হবে। সেই যে আমার পাথেয়, মহারাজ।"

"আমি তা জানি, অমৃতা। তাই ত সেই ব্যবস্থাও আমি করেছি। জান ত, সবাই আমার কথা মান্য করে। তুমি যেমন আশ্রমে আসতে, তাই আসবে ও কলেজের সময় কলেজে যাবে। ছুটির দিনগুলো বেশীর ভাগ এখানেই কাটাবে।"

"মহারাজ, ঈশ্বরকে ত আমি কোনদিন চোখে দেখি নি। আপনি ও মা, এই আমার ঈশ্বর, ইহকাল, পরকাল। এখন মা আমার মনের মধ্যে। আর আপনি আমার চোখের সামনে।"

প্রণাম করতেই মহারাজ মাথার ওপর সস্নেহে হাত রাখলেন, "শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সর্বদা সত্যের পথে থাকবে। এই কথাই আমি সারদাকে বলতাম। তোমাকেও বলি অমৃতা।'

॥ ছয় ॥

হুস করে মোটর বালীগঞ্জ সারকুলার রোডের একটা বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকল।

"দেখ, তোর বোধিসত্ত্ব হুজুরে হাজির।" রিণরিণ চেঁচিয়ে উঠল।

দূরে দেখা গেল একটি ছেলে লনে হাঁটছে। চোখে কাল রংয়ের আজকালকার ফ্যাশনের পুরু রিমওয়ালা চশমা। এই ফ্রেমের চশমার একটা বিশেষত্ব আছে। বুদ্ধিহীনদেরও বুদ্ধিমান দেখায়।

আর বুদ্ধিমানদের ত কথাই নেই। তার সঙ্গে দেয় একটা ব্যক্তিত্ব। আজকালকার ছেলেরা তাই বেশীর ভাগই এই রকম চশমাই পরে।

বোধিসত্ত্ব অবশ্য এমনিতেই বুদ্ধিমান এবং চেহারা ও চালচলনে তা বেশ মালুম দেয়। যাকে বলে নরম-গরম বুদ্ধিমান ভালো ছেলে। গাড়িবারান্দাতে ততক্ষণে গাড়ি থেমেছে।

"বোধিসত্ত্ব, তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে না কেন? খুব ঠকেছ। গ্র্যাণ্ড ছবি।" রিণরিণ থামল।

"দেবী তথাস্তু, বলেন নি, তাই।"

"বলিনিই ত। বোধিসত্ত্ব, তোমাকে ত বলেছি, আর ক'মাস পর থেকে রেস্ট অব দি লাইফ ত উঠতে-বসতে বোধিসত্ত্ব আর বোধিসত্ত্ব। নো এসকেপ। তাই ক'টা দিন একটু হাড়ে বাতাস লাগিয়ে নিচ্ছি।" সঙ্গীতা বলে উঠল।

"এ আবার কি কথা? বোধি, আমি কিন্তু কিছু জানতাম না। সু, তুই যে কি বলিস। তবে ইন এ ওয়ে, আমিও কিন্তু একটু একটু 'সু'র কথায় সায় দিচ্ছি।"

রিণরিণ হেসে উঠল, "উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী, কিশোরী করেছি সার—তাই না, বোধি?"

"যাক বাবা, আমি আর কি বলব। তুই বন্ধুই যখন একদিকে, আমি ত নাচার। প্রথম একটু যেন আশার আলো দেখছিলাম। পরে দেখলাম যে তিমিরে সেই তিমিরেই।"

দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখা গেল, একটি উঠতি বয়সের ছেলে, সদ্য গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।

"একি, তোমরা সব বাইরে জটলা পাকাচ্ছ! বাড়িতে কেউ নেই?" অনুজ বলে উঠল।

সঙ্গীতার ছোট ভাই অনুজ, সদ্য কলেজে ঢুকেছে। যাকে বলে 'ফার্স্ট ইয়ার' নো ফিয়ারে'র যুগটা চলেছে।

"কিরে, কেমন দেখলি? বাইরে কেন সবাই? বাড়িতে কেউ নেই?" অনুজ থামল।

বোধি এগিয়ে এলো—"আমি সবার হয়ে উত্তর দিচ্ছি, একের পর

এক। এতগুলো প্রশ্নের উত্তর ত আর একসঙ্গে দেওয়া যাবে না। বাড়িতে তোমাদের বাবা তাঁর দুই বন্ধু নিয়ে গুলজার করছেন। মা অমৃতা মাসীকে আনতে গেছেন। দুই দেবীরা এইমাত্র আবির্ভূতা হয়েছেন। আমি লনে হাঁটছি।"

"বোধিদা, তুমি যাও নি কেন? কি রকম দেখলিরে তোরা?"

"প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিচ্ছি। কারণ এটা আমার বিষয়ে। তোমার দিদির হুকুম মেলে নি, তাই সিনেমাতে যাই নি।" বোধি থামল।

"বোধিদা, তুমি যে কি! হুকুম আবার কি? তুমি তোমার মনে চলে যেতে। আমি হলে···।"

"তোমার বোধিদা নামেই বোধিসত্ত্ব। কাজে সব সময় তা নয়। আমি আগেই একদিন দেখে এসেছি। হুকুমনামা ত আগে থেকেই জারি করা আছে।"

"ওমা! তুমি ত বেশ। কিছু বলনি ত! ঠিক আছে। আমিও এখন থেকে যদি কোন কথা বলি।"

"বারে, তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নি। করলেই বলতাম।"

রিণরিণ মধ্যস্থতা করল,—"আমি বলছি, সু ঠিক কথাই বলেছে। সারাজীবন ত তোমাকে টেনে নিয়ে চলতে হবে, তাই ক'টা দিন। আর তাছাড়া বোধিও ঠিক বলেছে। সু, তুই ওকে জিজ্ঞাসা করিস নি। তাই কুইটস্।"

হৈ-চৈ করতে করতে চারজনে ঢুকল গিয়ে বাড়ির মধ্যে।

বসবার ঘরে বসে মিস্টার চৌধুরী আড্ডা দিচ্ছিলেন। সবাইকে দেখে বলে উঠলেন, "যাক, সবাই পৌঁছে গেছ। এখন অমৃতা মাসীকে নিয়ে এসে পৌঁছালেই সবাই খেতে বসা যাবে।"

অন্য ঘরে গিয়ে গোল হয়ে বসে সবাই আড্ডা জমাল।

"জান, সিনেমার চাইতেও বড় খবর হচ্ছে, রিণ আজকে কলকাতার রাস্তায় ট্রাফিক পুলিসের কাজ করেছে। বেশ দেখতে

একটা ছেলে এসে রিণকে উদ্ধার করল। তাই ত এত ভালো সিনেমাটা শেষ পর্যন্ত দেখতে পারা গেল।"

"কে ছেলেটা? কি নাম, রিণ?"

"জানি না ত। রিণ বলল।"

"রাগ লাগে না, বোধি? একবার জিজ্ঞাসা ত করবে? সে জীবনে বিয়ে করবে না, তাই কোন ইণ্টারেস্ট দেখাবে না।"

"তোমার ওপর যখন ইণ্টারেস্ট দেখায়, তখন ত তুমি এক কথায় বাতিল কর না? কিছুটা এগুতে দিয়ে তারপর এবাউট্ টার্ন কর।" সু থামল।

বোধি বলল, "সোজা উত্তর। কোন আগ্রহ দেখাই নি।"

"এইভাবে জীবনটা কাটাবি, রিণ?"

"কেন, নিজের লেজ কাটা গেছে বলে আর সবার লেজ কাটার দিকে নজর?" বলে একটু হাসল রিণ।

তারপর বলল, "দেখ সু, জীবনটা অত ছোট নয়। সারা জীবন কি হবে, কে কোথায় ভেসে যাবে, তার কোন কিছু ঠিক আছে?"

হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর দেখাল ওকে।

রিণের এই রূপটাকে সঙ্গীতা বড় ভয় পায়। ওকে যে ও বড় ভালোবাসে। ওর গলায় দুঃখের সুর ওকে ব্যথা দেয়। ওর হাল্কা, ঝলমলে হাসিমুখী রূপটাই ও দেখতে চায়।

তাই তাড়াতাড়ি কথার সুর পাল্টাল।

"চল, সকলে এক এক করে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নেওয়া যাক। মাসী ও মা এলেই খেতে বসা যাবে। কালকে ত রবিবার। অনেক রাত অব্দি আড্ডা দেওয়া যাবে।"

সবার আগে সবার ছোটটা সভা ভঙ্গ করে চলে গেছে।

অনুজ নিজের দিদিকে দিদি ডাকে, আর রিণকে ডাকে দিদি-ভাই। ছোট থেকেই রিণকে নিজের দিদির মতই ভালোবেসেছে। ছোট সময়ে ও জানতই না যে ও আপন দিদি নয়।

কেন এক বাড়িতে থাকে না, সেটাই ছিল ওর কাছে বড় সমস্যা। বাড়ির কেউ সেটা ঠিকমত বুঝিয়ে দেয় নি। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সব জেনেছে। কিন্তু ভালোবাসাটা একই রয়ে গেছে। ত্ব'জনকে এক-ভাবেই দেখে। লোকে জিজ্ঞাসা করলে এখনও বলে, আমার ছই দিদি।

তাই হয়। ভালোবাসার কাছে সবই একাকার হয়ে যায়।

মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে অমৃতা দেবী এসে ঢুকলেন।

"তুমি পারও বটে অমৃতা, খাটতে। সারাদিনের স্কুলের খাটুনির পর আবার কত রকম সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়েছ তার ঠিক নেই। এরকম করলে শরীর টি কবে? মেয়েটার কথাও ত একটু ভাববে? রিণরিণের পৃথিবী ত তুমি।"

"তা কেন? তোমরা ত আছ; আর তা ছাড়া শরীর ত আমার বেশ ভালো আছে। একশ' বছরের আগে যে আমার কিছু হবে মনে ত হয় না।" একটু হাসলেন।

অমৃতা দেবীকে কেউ কোনদিন জোরে হাসতে দেখে নি। যখন সকলে হেসে গড়াচ্ছে, তখনও তার মুখে মাত্র একটু মৃদু হাসি খেলে গেছে। কি যেন একটা চাপা ছুঃখ মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

মিস্টার ও মিসেস চৌধুরী অনেক সময়ই আলোচনা করেন।

মিসেস চৌধুরী বলেন, "অল্প বয়সে বিধবা। মা-বাবাও হারিয়েছে। তাই বোধহয় এত চাপা ও স্বল্পভাষী।"

"তা কেন? এ-রকম ত আরও দেখা যায়, কত আনন্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে," মিস্টার চৌধুরী বলেন।

"তা ঠিক। কিন্তু ছোট থেকে যে বলতে গেলে আশ্রমে মানুষ। তাই সংসারে থেকেও কেমন সংসারের বাইরে।"

"এটাই আসল কারণ।"

"ঠিক বলেছ। সংসার একেবারে ছাড়তে পারে নি রিণির জন্য। না হলে কি হোত বলা যায় না।"

খাওয়া-দাওয়ার পরে তুটি ঘরে এরা হয়ে গেল ভাগ।

মিস্টার ও মিসেস চৌধুরী অমৃতা দেবীকে নিয়ে জমিয়ে বসলেন। অন্য ঘরে বাকি চারজন। মিসেস রাও এই চৌধুরী পরিবারের একজন হয়ে গেছেন। তার নিজের বলতে মেয়েটি ছাড়া কেউ নেই।

তবে কলকাতাতে এসেও প্রথম থেকে রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছেন। কালচারেও যেমন যান, বেলুড়েও যান। তাঁর জীবে-সেবার ভিতর দিয়ে। এ বাড়ি ছাড়া ওঁরাই তার পৃথিবী।

অনেক বৎসর মেয়ের সঙ্গে প্যারিসে ছিলেন। কাজ করতেন, কিন্তু তার সঙ্গে নানা রকম জনসেবার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উনি অনেক করেন নিঃশব্দে সবার অজ্ঞাত সারে। তাই তাঁর কথা কেউ বড় একটা জানতে পারে না।

মিসেস চৌধুরী মাঝে মাঝে বলেন, মা আর মেয়েতে স্বভাবের দিক থেকে অনেক আলাদা। মা প্রশান্ত মহাসাগরের মতো শান্ত আর মেয়ে হচ্ছে বে অব বেঙ্গল।

"তা বটে," মিস্টার চৌধুরী বলেন, "লক্ষ্য করে দেখ। খুঁব গভীরে গেলে কিন্তু দু'জনে এক। লক্ষ্য করেছ রিণ এক এক সময়ে যেন কেমন অন্য রকম হয়ে যায়। ঠিক মা'র মতো শান্ত ধীর।"

"আসলে শুনেছি, ওর বাবা খুব হাসিখুশি, প্রাণ-প্রাচুর্য ভরা ছিলেন। তারই কিছুটা পেয়েছে মেয়ে। ওদের দেখলে মনটা কেমন করে ওঠে। অমৃতাকে আমার ছোট বোনের মতো লাগে, তাই ত ওর দিকে তাকিয়ে এক এক সময় বড় ব্যথা পাই মনে। কি বা বয়স, কি বা দেখল, কি বা পেল। রিণের বিয়ে হলে?"

"কেন, তুমি ত আছ। তোমার বোনই ত। আমরা ত শুধু দু'জন নই, তিন জন। তাই না?"

"ঠিক বলেছ," স্ত্রীর গায়ে হাতটা রাখেন।

"রাত কিন্তু অনেক হোল। এবার বোধ হয় সবারই রণে ভঙ্গ দেওয়া দরকার," চৌধুরী সাহেব বললেন।

"তবে, কাল কি করা যায় প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলা যাক। উইক ডেজ-এ ত রিণির পাত্তা পাওয়া মুশকিল। ততোধিক মুশকিল অমৃতা মাসীকে পাওয়া," সঙ্গীতা বলে উঠল। "আমি কিন্তু ফর এ চেঞ্জ সবার অজান্তে একটা প্রোগ্রাম করছি। একটু সকাল সকাল, মানে ধর তিনটে-চারটের সময় সবাই যাব ব্যারাকপুরে। আমার এক বন্ধুর ভারি সুন্দর বাড়ি আছে গঙ্গার ওপারে। সঙ্গে খাবার নিয়ে পিক্‌নিক মতো হবে। নদীর ধারে বেড়ান যাবে, ইচ্ছে হলে নৌকোতে ঘোরা যাবে।" চৌধুরী সাহেব থামলেন।

"বাবা তুমি এত সব ঠিক করে রেখেছ? বিণ, খুব ভালো হবে না?" সঙ্গীতা বলে উঠল।

"সত্যি, মেসোর বুদ্ধি আছে। না হলে এত বড় ব্যারিস্টার হতে পারত?" বিণ বলে উঠল।

"আমার কোন অসুবিধা হবে না। সকাল থেকে উঠে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের সব খাতাপত্র দেখে ফেলব। তাই ত, সকাল দশটাতে একজন আসবে আঁকা শিখতে। যাই হোক, বিকেলে নো প্রবলেম।"

"আমার যে আবার," অমৃতা দেবী মুখ খুলতে না খুলতে রিণরিণ মা'র মুখ চেপে ধরল।

"মা-মণি, তুমি আমাকে প্রমিস্ করেছ, সপ্তাহে একদিন তুমি-আমি একসঙ্গে থাকব। তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। 'স্থ'দের কথা আলাদা। ওদের আর আমাদের মধ্যে ত কোন তফাৎ নেই।"

অনুজ বলে উঠল, "তুমি মাসী আউটভোটেড। দিদিভাই ঠিক বলেছ।"

"তবে তাই ঠিক রইল, অমৃতা। আমরা তোমাদের ওখানে গিয়ে হাজির হব। ওখান থেকে দু'গাড়ি ভাগাভাগি করে গেলেই হবে।"

স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে চৌধুরী সাহেব বললেন, "এই শীতের ক'টা মাসই ত কলকাতায় বেড়াবার।"

ঘড়ির কাঁটা প্রায় বারটায় লাগছে। তাই কেউ আর কথা বাড়াল না।

বোধিসত্ত্ব মা ও মেয়েকে তাদের আস্তানায় নামিয়ে দিয়ে নিজের ডেরায় গেল ফিরে। রিণির সঙ্গে বলতে গেলে ওর মা'র সারাদিন দেখাই হয় না।

মা-মেয়ে পশ্চিমের অভ্যেসই রেখে চলেছে। নিজেদের ছোট্ট দু' কামরায় ফ্ল্যাটে তৃতীয় প্রাণী বাড়ায় নি।

সকালে উঠে রিণি ঘর-দোর পরিষ্কার করে ফেলে। অমৃতা হেভী ব্রেকফাস্ট তৈরী করে। মা মেয়েতে খেয়ে যে যার কাজে বের হয়ে যায়।

রিণি এখন আর্ট কলেজের লেকচারার। তাছাড়া দু-একটা টিউশনিও করে। বাড়িতেই আসে ছাত্র-ছাত্রীরা। কোথাও গিয়ে নষ্ট করার মত সময় ওর নেই।

মাকে ও বাঁধা কাজ আর করতে দেয় না। দরকারও নেই। অমৃতাদেবী যদি কিছু করতে চান, তাই করেন। রিণি তাতে বাধা দেয় না। মা যাতে খুশী হন, যাতে আনন্দ পান, বড় হওয়ার পর থেকে তার লক্ষ্যটাই সেই দিকে।

মিশনারী স্কুলেও পার্টটাইম পড়ান, মিশনেও পার্টটাইম পড়ান। তাছাড়া জনসেবা, জনকল্যাণ কাজের অনেক কিছুর সঙ্গেও জড়িয়ে আছেন।

রিণি বাইরে থেকে না আসা অব্দি পুরোপুরি ভাবেই কাজ করতেন। তিনিই সব চালাতেন। এখন মেয়েই আসল ভারটা নিয়েছে।

অমৃতা দেবীর অনেক সময় বড় দুঃখ হয়, সারদা দেবীর কথা ভাবলে। মাকে তিনি তেমনভাবে করবার সুযোগ পান নি। ছাত্রী অবস্থাতেই তাকে হারিয়েছেন। আর কিছুদিন এই পৃথিবীতে থাকলে বোধহয় অন্য রকম হোত।

মাঝে মাঝে মনের ভিতরটা তাঁর কেমন কেঁপে ওঠে। তাঁর কি এমন আগের জন্মের পাপ রয়েছে যার জন্য তাঁর সংস্পর্শে যেই এসেছে, সেই চলে গেছে।

মা—।

এমন দেবতার মতো স্বামী।

কত সময় রাতে ঘুম ভেঙে যায়। উনি পাশে শুয়ে থাকা মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে ওর মঙ্গল কামনা করেন। তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে মা সারদার ছবির কাছে দাঁড়িয়ে রিণির জন্য প্রার্থনা করেন।

সেইরকম তাঁর গুরুদেব, যাঁর দয়াতে তিনি এই পৃথিবীতে মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার পেয়েছেন। তারপর তাঁর বড় ভালোবাসার স্বামী যাঁকে আশাতীতভাবে পেয়েও হারিয়েছেন, তাঁর ছবির কাছেও মাথা নোয়ান।

একই প্রার্থনা,—'রিণিকে রক্ষা কোর, আর আমাকে পথ দেখাও।'

এই তিনটি ছবি ওদের শোবার ঘরে আছে। কত রাতে কতবার রিণি এই দৃশ্য দেখেছে।

ছোট থাকতে মাকে ডেকে বলেছে, "রাতে উঠে তুমি এই তিনটা ছবিতে প্রণাম কর কেন? দিনে ত করতে পার?"

"পাগলী, প্রার্থনা, প্রণাম করার কি কোন বিশেষ সময় আছে? মন যখন চায়, তখনই করি। দিনেও করি, রাতেও করি।"

এখন রিণি বড় হয়েছে। ও সব বোঝে। মার জন্য ওর মন কেঁদে ওঠে। ইচ্ছে করে মাকে জড়িয়ে ধরে সব দুঃখ মুছে দেয়।

কিন্তু কিছুই করে না। যখন প্রণাম শেষ করে এসে মা তার মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করেন, তখনো ও ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকে আর মনে মনে মার জন্য প্রার্থনা করে।

বাড়ি ফিরে দু'জনে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। সকালে অনেক কাজ আছে। বাড়ির কাজ সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে রিণি বসবে ছাত্র

নিয়ে। অমৃতা দেবী বেরিয়ে যাবেন। আশ্রমে কি যেন একটা কাজ আছে।

তাই রিণিও দুপুরের রান্না সেরে ফেলবে। বেশীর ভাগ রবিবার দিনটি তাই হয়। আর রাতের ব্যাপার ত বাঁধা সঙ্গীতার বাড়িতে।

আর সব দিন কিন্তু মা-মেয়েতে রাতে ফিরে নিজেরা হাতে হাত লাগিয়ে রান্না করে খায় বা কখন-সখনও বাইরে খেয়ে আসে।

সেই সময়টা তৃতীয় ব্যক্তির সান্নিধ্য ওদের ভালো লাগে না। দু'জনে তখন হয়ে ওঠে দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বেশীর ভাগ সময় রিণি বক্তা, অমৃতা শ্রোতা।

রিণির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অমৃতা যেন কৃষ্ণ রাও-এর সান্নিধ্য পায়। সেও ঠিক এই রকম ছিল। অফুরন্ত কথা বলে যেত, আর সে শুনত, ঠিক এখন যেমন রিণির কথা শোনে। রিণির ভিতরে যেন সে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

কত সময় এমন হয়েছে, অমৃতা যেন ভুলে গেছে তার বয়স হয়েছে। তার কৃষ্ণ বেঁচে নেই অনেক কাল।

সে যেন হয়ে যায় বিয়ের পরের অমৃতা। সেই সময় যখন রিণি জন্মায় নি। সেই সময় যখন রিণি ছোট্ট।

"মা তুমি কি দুষ্টু। আমি বকে মরছি। তুমি কিন্তু আমার কোন কথা শোন নি। তুমি তোমার ভাবরাজ্যে। বেশ, আমি আর কোন কথা যদি বলি।"

"ঠিক আছে, অন্যায় হয়ে গেছে। এবারকার মতো মাপ করে দে।"

রিণির রাগ জল হতে এক মিনিট। আবার তার অনর্গল কথা আরম্ভ হয়ে যায়। মার সান্নিধ্য বা বন্ধুত্ব ওকে যত আনন্দ দেয়, আর কারও দেয় না।

রিণির বন্ধুর অন্ত নেই। সবাই বন্ধু। কিন্তু সত্যি বলতে ও মাকেই একমাত্র বন্ধু মনে করে।

অবশ্য তার পরেই সঙ্গীতা। মা'র কাছে সব কিছু যেমন বলতে পারে, সঙ্গীতার কাছেও বুঝি তা পারে না।

॥ সাত ॥

সেদিন ছুটি। সূয্যি মামা মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছেন।

অমৃতা তার ফ্ল্যাটের ছোট বারন্দাটাতে বেতের চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

সে দিনটাও এমনি মেঘলা ছিল। সূর্য ঠাকুরেরও মানুষের মত বিশ্রাম নেবার ইচ্ছা হয়। তাই বোধ হয় তাঁর উপস্থিতি থেকে আমরা বঞ্চিত।

সারদা দেবী মারা গেছেন কিছুদিন হয়েছে। অমৃতা এম-এ ক্লাসের ছাত্রী। আশ্রমের আশ্রয়ে তার দিনগুলো শান্ত স্থিরভাবে কেটে যাচ্ছিল।

মা'র অভাব অনেকটাই মহারাজ পূর্ণ করার চেষ্টা করতেন তাঁর স্নেহ মমতা দিয়ে। অমৃতাও ছুটে ছুটে তাঁর কাছে চলে আসতো সুযোগ পেলেই।

চিরকালই সে নিঃসঙ্গ। বন্ধু-বান্ধব, হৈ-চৈ তার ভালো লাগে না। অনেকেই তার কাছে আসতে চেষ্টা করেছে—ছেলে বা মেয়ে, সহপাঠিনী বা পাঠী। কিন্তু তার মনের নাগাল কেউ পায় নি। তার চেহারা ও স্বভাব, দুটোই লোককে কাছে টেনে এনেছে যেমন, তেমনি তার নিস্পৃহতা তাদের ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

একটি লোক, অল্প দিন হোল যেন অমৃতার মনে সামান্য হলেও ছাপ ফেলেছেন। ডঃ কৃষ্ণ রাও।

এম-এ পড়াতে এসেছেন। প্রথম চাকরি। বড় পণ্ডিত বলে অল্প দিনেই বেশ নাম-ডাক হয়েছে।

হার্ভার্ড ইউনিভারসিটি থেকে ডক্টর হয়েছেন। ও দেশেই থেকে যেতে পারতেন, কিন্তু দেশের টানে ফিরে এসেছেন।

ছিমছাম স্মার্ট। মিষ্টভাষী। বরঞ্চ বলা যায়, কথা বোধ হয় একটু বেশী বলেন। হাসেনও একটু বেশী। ঠাট্টা-তামাশাও করেন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে।

বন্ধুর মত ব্যবহার তাঁর। ওসব দেশে থেকে থেকে এটাই অভ্যাস হয়েছে। প্রফেসার হলেই যে তাঁর সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে সেটা তিনি মনে করেন না। সকলের নামই অল্পদিনের মধ্যে মুখস্থ করে ফেলেছেন। সবাইকে নাম ধরেই ডাকেন।

মেয়েরা ত ডঃ বাও বলতে পাগল। কার সঙ্গে বেশী কথা বললেন, কার দিকে বেশী তাকালেন, তাই নিয়ে আলোচনাতে কমন রুম সরগরম।

একমাত্র অমৃতাই এর ব্যতিক্রম।

"কিরে অমৃতা, তোর কেমন লাগে?" অনেকেই একদিন জিজ্ঞাসা করল অমৃতাকে।

অমৃতা হেসে বলেছিল, "ভালোই ত।"

"ওর কথা ছেড়ে দে। ওর মধ্যে কোন রস-কস থাকলে ত," মিনাক্ষী বলেছিল।

কেউ ত তখন জানে না, সেই নীরস মরুভূমিতেই বোধ হয় একটু সবুজের রেখা দেখা দিয়েছে।

অমৃতা মেঘলা সকালে একলা হাঁটতে বেরিয়েছিল। ছুটির দিন, রোদের তাপ নেই। ইচ্ছে হেঁটেই আশ্রমে চলে যাবে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে কিছু বই আছে। মহারাজের ঘরে বসে সারাদিন পড়বে। সন্ধ্যায় আরতির শেষে হোসটেলে ফিরবে।

"কে? অমৃতা না?"

যাঁর কথা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, তাঁর স্বর শুনে কেমন যেন প্রথম চমকে উঠেছিল অমৃতা।

তার মনের কথাই কি প্রাণ পেল?

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, ডঃ কৃষ্ণ রাও একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সত্যিই ও চমকে উঠেছিল।

"তুমি মাথা নীচু করে কি যেন ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলে। তাই আমাকে দেখতে পাওনি। খুব চমকে দিয়েছি, না?"

"হ্যাঁ, একটু চমকে গিয়েছি বৈকি," অমৃতা বলল।

"আমি তোমাকে বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করছি। তুমি অবশ্য জান না। তাছাড়া, আমিও খুব ডিসক্রিট ভাবেই করি। না হলে, সবাই তোমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে দেবে।

তবেই বুঝতে পারছ, আমি কি রকম বুদ্ধি রাখি। বেশীর ভাগ সময় যাকে দেখি, সেই-ই টের পায় না।

অমৃতার ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠল। বুকের ভিতরটা যেন কেমন করতে লাগল।

কোন উত্তর না দিয়ে অমৃতা চুপ করে রইল।

কেন এমন হোল? একেই কি ভালোবাসা বলে? কিন্তু অমৃতা যে ঠিক করেছে সে কোনদিন সংসারে ঢুকবে না।

তার মা সংসারে থেকে সন্ন্যাসিনী ছিলেন। সে ত বলতে গেলে আশ্রমে মানুষ হয়েছে মহারাজের স্নেহে। যদি সে সন্ন্যাসিনী পুরোপুরি নাও হয়, জীবনটা সেইভাবেই কাটাবে। এই বয়স পর্যন্ত তার মন একতারেই বাঁধা ছিল।

হঠাৎ সেটা কেন অন্য সুর ধরল?

না, তা হয় না। তাকে সংযত হতে হবে।

"কি হোল? চিন্তামগ্না অমৃতা আবার চিন্তায় ডুবে গেলে নাকি? কী এত ভাব? অন্য আর সবার চাইতে তুমি একেবারে অন্য রকম। অন্য ছাঁচে গড়া। নিজের মধ্যে তুমি থাক।"

"আপনি এত লক্ষ্য করেছেন?"

"তা করেছি বৈকি। যাদের পড়াই, তাদের আমি নিজের মনে

করি। তাই তাদের বুঝতে চেষ্টা করি। না হলে, আমি তাদের মনের মত করে কি করে পড়াব? আমি চাই, তারা শিখুক, জানুক। শুধু গিলুক, সেটা আমার ইচ্ছা নয়।"

অমৃতার মনে হোল ক্লাসের হাসিখুশী মিশুক লোকটার ভিতরটা হাল্কা নয়।

"তুমি জান না অমৃতা, আমি তোমায় সব খবর নিয়েছি।"

"সে কি? আপনি এত কষ্ট করে আবার খবর নিতে গেলেন কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই আমি বলে দিতাম।"

"তুমি কি ভাব আমার একটুও কষ্ট করতে হয়েছে? মোটেই না," বলে তিনি হাসলেন।

"হাসলেন কেন?"

"তোমাকে নিয়ে ইউনিভার্সিটির সকলে তোলপাড় করছে। আর তুমি নীরস, স্থির বলেই এই কথাটা বললে। সকলেই ত তোমার সব কথা জানে।"

অমৃতা একটু হাসল, "তবে ত আপনি সবই জানেন।"

"তুমি কোথায় যাচ্ছিলে, এই ছুটির সকাল বেলাতে?"

"আমি? আমি আশ্রমে যাচ্ছিলাম।"

"সুযোগ পেলেই ওখানে যাও, না!"

"ঠিক তাই। এই এত বড় পৃথিবীতে আমার বলতে আছেন মহারাজ, আর আমার ছোট্ট সংসার হচ্ছে ঐ আশ্রম।"

"সারাটা জীবন কি তুমি তাই নিয়ে থাকবে, অমৃতা? এর বাইরে কখনও চোখ মেলে তাকাবে না?"

হঠাৎ কি এক আলোতে অমৃতার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"সেই রকমই ত আকাঙ্ক্ষা। এত বড় সৌভাগ্য আমার হবে কিনা জানি না।"

ডঃ রাও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন। সকালের স্নিগ্ধ আবহাওয়াটাতে তিনি চিড় খাওয়াতে চাইলেন না।

"যাবে অমৃতা আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে? আশ্রমে যেতে দেরী হবে। মানে, যেমন সময় তুমি পৌঁছাবে ঠিক করেছ তার চাইতে দেরী হয়ে যাবে," ডঃ রাও থামলেন।

"না, তা ঠিক নয়। আমার যাবার ত কোন বাঁধাধরা সময় নেই। মন চাইলেই চলে যাই। সে স্থান ত আমার আপন। এখন যে আমি যাচ্ছি, তা ত কেউ জানে না।"

"তাহলে ত কোন অসুবিধা নেই। চল না অমৃতা, আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে। তুমি হাঁটতে ভালোবাস। আমিও ভালোবাসি।"

অমৃতা প্রথম একটু ইতস্ততঃ করল।

তারপরই মন স্থির করে ফেলল। নিজের মনের দুর্বলতাকে সে দূর করে দেবে। স্বাভাবিক হবে। এই ও সুযোগ। এতেই তার মন সংযত হয়ে যাবে।

"বেশ ত চলুন।"

"আমি আশা করিনি তুমি রাজি হবে। তোমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে অনেকদিন থেকে। সুযোগ পাচ্ছিলাম না।"

"আপনার ত প্রফেসারস রুমে আলাদা ঘরই আছে। ক্লাসে বললেই সেখানে আমি যেতাম।"

"না, ঠিক সেইভাবে নয়। স্বাভাবিক পরিবেশে। ঠিক যেমনটি আজকে দেখা হয়ে গেল।"

অমৃতা মন ঠিক করে ফেলেছে। এ ধরনের কথায় বিশেষ সায় দেবে না। সে চুপ করে রইল।

"অমৃতা, তোমার সমুদ্র কেমন লাগে?"

"খুব ভালো লাগে।"

"তবে চল, একটা ট্যাক্সি করে ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ থাকা যাক। তারপর তুমি চলে যাবে তোমার পথে, আমি আমার।"

সমুদ্র অমৃতারও খুব ভালো লাগে। বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে।

ঠিক এই মুহূর্তে মেঘের ছায়াতে ঢেউগুলো কেমন রূপ নিয়েছে, দেখবার ইচ্ছে হঠাৎ অমৃতার হোল।

"তাই চলুন।"

প্রকৃতিকে নানা রূপে, নানা ভাবে অমৃতা বড় ভালোবাসে। ছোট থেকেই তাদের সঙ্গে মনের কত কথা সে বলেছে। এখনও বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার সঙ্গে, ঝিকিমিকির সঙ্গে, পাখির ডাক বা গাছের ফুলের সঙ্গে যে একাত্ম বোধ তার আছে, সেটা তার মনে হয় মানুষের সঙ্গে নেই।

মা-ই তার কাছে জীবন্ত মানুষ ছিলেন। তাছাড়া আর কোথাও সে প্রাণের টান বোধ করে না।

মহারাজের কথা আলাদা। তিনি তার গুরু, তিনি তার কাছে স্বয়ং ব্রহ্ম।

সেদিন যেন সমুদ্র এক নতুন সাজে সেজেছে। মেঘের ঘোমটা ক্ষণে ক্ষণে ফাঁক করে যেন কাকে দেখবার চেষ্টা করছে। মেঘে ঢাকা ঢেউগুলো মাঝে মাঝে চিড় খেয়ে যাচ্ছে। সেই ফাঁকে চকিত চাহনি নজরে পড়ছে।

অমৃতার বড় ভালো লাগছিল। বিশেষ করে কৃষ্ণ রাও-র পাশে পাশে হাঁটতে।

যদিও মন থেকে তাকে সরিয়ে দিয়েছে, তবুও তার রেশটুকু এখনও রয়ে গেছে।

সবচাইতে ভালো লাগছিল এত কথুনি মানুষটি কিন্তু কোন কথাই বলছিলেন না। একমনে হাঁটছিলেন। কি যেন একটা ভাবের মধ্যে ছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন, "অমৃতা, চল তোমাকে আশ্রমের কাছাকাছি পৌঁছে দি। আর দেরী করা তোমার ঠিক না। মহারাজ নিশ্চয়ই ছুটির দিনে তোমাকে আশা করবেন।"

"তাই চলুন।"

আশ্রমের কাছে এসে কৃষ্ণ রাও ট্যাক্সি থামালেন। "অমৃতা, তোমার সঙ্গে ত কোন কথাই হোল না। আসছে রবিবার আবার আশা করব তোমাকে, ঠিক যেখানে তোমাকে দেখেছিলাম, ঠিক সেই সময়।"

অমৃতা শত চেষ্টা করেও না করতে পারল না। মুখ দিয়ে কিছু বের হোল না। শুধু মাথা নেড়ে সায় দিল।

সামনে দিয়ে ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল। অমৃতা আশ্রমে ঢুকতে ঢুকতে তার কাজটা ঠিক সমর্থন না করতে পারলেও অ-ঠিকও মনে করতে পারল না।

সে ত সবার সঙ্গেই কথা বলে, মেশে। তবে এর সঙ্গেই বা কথা বলবে না কেন? না বলাটাই ত বিশেষ করে দেখার পর্যায়ে পড়ে। তার চাইতে আর সকলের সঙ্গে এক দলে ফেলে দেওয়াই ত ভালো হয়েছে।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আশ্রমে ঢুকে গেল। কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করল না। এখানকার মেয়ের মতই সে আসা-যাওয়া করে।

সে সোজা চলে গেল মহারাজের ঘরে।

এইভাবে অমৃতার সঙ্গে কৃষ্ণ রাওর মাঝে-মাঝেই দেখা হতে লাগল। প্রায়ই দু'জনকে সূর্য ওঠার সময় সমুদ্রের ধারে জলেতে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখা যেত। অনেক সময় দু'জনেই নীরব।

তবে বেশীর ভাগ সময়ই একজন বক্তা, একজন শ্রোতা।

ডঃ রাও কত কি যে বলে যেতেন একটানা। কখনও তাঁর বিদেশের অভিজ্ঞতা, হার্ভার্ড ইউনিভারসিটিতে প্রথম গিয়ে কেমন তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এখানকার মানুষগুলো দেশটাকে কী করে ফেলেছে।

"ভগবানের সৃষ্টির ওপরও কত কিছু করবার রয়েছে তা যেন ওখানকার লোকেরা বুঝিয়ে দিয়েছে বা বুঝিয়ে দেবার জন্য যাকে বলে উঠে-পড়ে লেগেছে।"

"তা কেন-? চেয়ে দেখুন, এক সময় আমাদের দেশবাসীরাও সেই

ভালেই চলেছিল। চারিদিকের মন্দিরের কারুকার্য দেখলে কি তা মনে হয় না ?"

"ঠিকই বলেছ, অমৃতা। ক'দিন পর থেকে, মানে প্রথম ভালো লাগার মোহটা যখন কাটতে আরম্ভ করল, তখন মনে মনে আমার দেশকে চোখ খুলে দেখতে শিখলাম। তুমি এখান থেকে যা বুঝেছ, আমার উপলব্ধি হয়েছে তা সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে।"

"একথা কেন বলছেন ?"

"ঠিকই বলছি, অমৃতা। ঘরের কোণের সৌন্দর্য চোখে পড়ে নি। এই যে আমাদের অপূর্ব স্থাপত্যবিদ্যা, এই যে হাতের কাছে কাপালিশ্বরের মন্দির—মানে শিবের মন্দির, এর হাতের কাজ কি কম সুন্দর ? এর গোপুরম চোখকে টেনে রাখে। অষ্টম শতাব্দীর পল্লব রাজাদের বিষ্ণুর মন্দিরেরই বা কি রূপ !"

"আমার মনে হয়, অনেক অনেক আগে আমরা যে কাজের আনন্দে মেতে উঠেছিলাম। ঈশ্বরের দয়ার দান যেমন আমাদের মুগ্ধ করেছিল, তেমনি আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। আমরাও ত তাঁরই সন্তান। আমরাই বা কম কিসে ?"

"ঠিক বলেছ অমৃতা ; বড় সুন্দরভাবে বলেছ।"

"পরে শেষে আমরা পড়েছি ঝিমিয়ে, আর ওদের এসেছে কর্মের প্রেরণা"

"তাই, কিন্তু কেন এমন হোল ? বুঝি নানা ধাক্কা খেতে খেতে আমরা হয়ে পড়েছি নিস্তব্ধ। তাই বোধহয় কজন আর কবিগুরুর মত দুঃখের মধ্যে প্রেরণা শান্তি, দুই-ই আছে, সে কথা বুঝেছে ও বোঝাতে চেষ্টা করেছে !"

"আপনি বুঝি রবি ঠাকুরের খুব ভক্ত ?"

"হ্যাঁ, উনিই আমার গুরু। তাঁর লেখা পড়বার জন্য, তাঁকে মনে-প্রাণে বুঝবার জন্যই ত আমি বাংলা শিখেছি।"

"সে কি ? আপনিও বাংলা জানেন ?"

"হ্যাঁ, জানি ত।"

"আমিও যে জানি।"

"সে কি? তুমি, কেন?"

"আমার ত সবই জানেন। মা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তাই বাংলা শিখেছিলেন তাঁর কথামৃত পড়বার জন্য। তাছাড়া তাঁর গুরুদের ত বাঙালী।"

"সেই করে ছোট থেকে তুমিও বাংলা শিখেছ?"

"তাই।"

"দেখ, আমাদের দু'জনের অনেক দিকে অমিল থাকলেও, এইদিকে কিন্তু খুব মিল। তাই না?"

ডঃ রাও প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। অমৃতার স্বভাবসিদ্ধ হাসির রেখা মুখের ওপর ফুটে উঠল।

এইভাবে তাদের প্রায়ই দেখা হোত এখানে-সেখানে। কখন-সখনও ওরা পানথিয়ার রোডের উপরের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীতে গিয়ে অনেক সময় কাটাত। এইভাবে মাঝে মাঝেই ওদের দেখা হতে লাগল নিভৃতে, নিরালায়।

ক্লাসে অবশ্য কেউ কোন রকম ব্যতিক্রম বুঝতে পারত না।

অমৃতার কৃষ্ণ রাওর সঙ্গে ঘুরতে খুব ভালো লাগত। এইভাবে তাঁর পরিবারের অনেক কথাই তার জানা হয়েছিল।

সনাতনপন্থী পরিবারের গোঁড়া ব্রাহ্মণের ছেলে। একটু বড় হতেই মা মারা যান। বাবা আবার বিয়ে করেন।

আপন ভাই-বোন কেউ নেই। সৎভায়েরা আছে।

তিনি একাই পড়াশুনায় ভালো। স্কলারশিপের উপরেই এগিয়েছেন। যখন বাইরে যাবার জন্য সুযোগ পেলেন, বাবা-মা দু'জনেই বেঁকে বসলেন। ম্লেচ্ছের দেশে যাওয়া চলবে না। গ্রামে জমিজমা আছে। তাই নেড়ে চেড়ে বেশ চলে যাবে।

উনি যাবেনই।

তখন অনেক টাকা পাঠাবেন ও গ্রামে আর ও জমি কিনতে পারবেন, এই কথাতে কাজ হোল। সৎমা বাবাকে বোঝালেন, তোমার ত আর দুটা ছেলে আছে। তারাই আমাদের মুখ রাখবে। বেয়াড়া ছেলে যাক বাইরে। সেখান থেকে টাকা পাঠাবে।

বাবাও ভাবলেন, কথাটা মন্দ নয়। একটা দেশী কথা আছে না, আমাদের দেশে, "মা মরলে বাপ তালই"। সব সময় তা হয় না। তবে দেখা গেল, এক্ষেত্রে হোল তাই। উনি রাজি হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণ রাওও প্রণাম করে কালাপানি পাড়ি দিলেন।

"ফিরে এসে কি হোল ?" অমৃতা চোখ বড় বড় করে শুনছিল।

"তারপর আর কি ? এখানকার পিছুটান বিশেষ কিছু আমার ছিল না। আরও রইল না।"

"ওখানেই থেকে গেলেন না কেন ? অনেকেই ত থাকে।"

"ভেবেছিলামও তাই। একটা মেয়ের সঙ্গে অল্প-স্বল্প ভাব-সাবও হচ্ছিল।

হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল একটি নিগ্রোর দিকে তাকিয়ে, সেই মেয়েটারই দু'চোখে কি ভীষণ ঘৃণার ছায়া পড়ল।"

"কেন ?"

"কালার প্রতি অবজ্ঞা। তখনই চোখ খুলে গেল। আজ কালা, কাল ব্রাউন হতে কতক্ষণ লাগবে। এ রোগে ত সারা পশ্চিম আজ ভুগছে। নিজের দেশ থাকতে কোন্ দুঃখে ওখানে সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে পড়ে থাকব ? মনস্থির করে ফেললাম। আজ আমি এখানে।"

এইভাবে আর একদিন বেড়াতে বেড়াতে শুনল, ডঃ রাওকে এখনও বাবা বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেন না। কারণ গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হননি। তবে তাঁর টাকা নিতে বাড়ির কারও আপত্তি নেই। আমেরিকা থেকেও সব টাকা পাঠাতেন। তাই তাঁদের অবস্থা বেশ ভালো হয়ে গেছে। কফির বাগিচাও কিনেছেন।

"দু ছেলেরই বিয়ে দিয়েছেন। পূর্ণ সংসার। ঠাই হওয়া এমনিতেই মুশকিল। সে সব কথা আমাকে বিশেষ দুঃখ দেয় না। ছোট থেকেই বাড়ির বাইরে বাইরেই কাটিয়েছি। দেশকে আমি ভালোবাসি। সেই দেশ আমাকে দু'হাত বাড়িয়ে নিয়েছে। আর আছে আমার বই।"

অমৃতা চুপচাপ সব শুনত। মনের ভিতরটা ডঃ রাওর জন্য কেমন করে উঠত।

অজান্তেই আস্তে আস্তে ও ওঁর দিকে মনে মনে এগিয়ে যেতে লাগল। বুঝতে পারত কৃষ্ণ রাওর ওর প্রতি দুর্বলতা। সোজাসুজি ঠিক না বললেও, আকারে-প্রকারে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারত।

॥ আট ॥

একদিন স্বামীজী জানলা দিয়ে দেখলেন। অমৃতাকে কৃষ্ণ রাও পৌঁছে দিয়ে বাইরে থেকে চলে গেলেন।

ডঃ রাওয়ের সঙ্গে সামনাসামনি আলাপ না হলেও চেহারাতে তাঁকে চিনতেন। অমৃতার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কি অনুভব করলেন।

"মহারাজ, আমি এসে গেছি," বলে অমৃতা মহারাজের পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসল। এইভাবে কিছু সময় বসাটা ছিল অমৃতার ছোট থেকে অভ্যেস।

"কিছু বলবে?"

"না, তেমন কিছু নয়," বলে অমৃতা মহারাজের মুখের দিকে তাকালো।

তাঁর চোখে যেন কি এক জিজ্ঞাসা, যদিও উনি চুপ করেই আছেন।

অমৃতা ছোট থেকে সব কথাই ওঁর কাছে বলে। এই যে এক নূতন অনুভূতি বোধ করছে, সে কথা অবশ্য বলা হয় নি।

এখনও অমৃতা সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। মন তার এখনও নিজের

হাতে। সরিয়ে আনতে চাইলেই পারবে। আঘাত লাগবে প্রাণে ঠিকই, তবুও।

তখনি মনে হোল, এটাই হচ্ছে সত্যিকারের সময়, যখন দু'দিকই খোলা আছে। পেছিয়েও আসতে পারে, এগিয়েও যেতে পারে। এরপর বলার ত কোন মানেই হবে না। বলা না বলার বাইরে গিয়ে গুরুজনকে জানানো না বলার সামিল।

"মহারাজ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনাকে আমার অনেক কথা বলার আছে।"

"বল, কি বলতে চাও।"

"আমি এই পর্যন্ত ঠিক করেছিলাম, সংসারে সে রকমভাবে আমি কোনদিন জড়াবো না। এইভাবেই সেবার মধ্য দিয়ে আপনার আশ্রয়ে কাটাব।"

"তাতে বাধা পড়েছে?"

"না, ঠিক সে রকম বাধা নয় যে সেদিক থেকে ফেরা চলে না।"

"সংশয়টা খুলে বল।"

"আমাদের প্রফেসার, ডঃ রাওর কথা বোধহয় আপনি শুনেছেন।"

"শুনেছি বৈকি। বিরাট পণ্ডিত লোক। ভাবছি তাঁকে একদিন ডাকব লেকচার দিতে।"

অমৃতাকে চুপ করে থাকতে দেখে মহারাজ বললেন, "বল অমৃতা, তুমি কি যেন বলতে চাইছিলে?"

"ডঃ কৃষ্ণ রাও মনে হয় আমাকে বিয়ে করতে চাইবেন।"

"মানে?"

"সোজাসুজি না বললেও বুঝিয়ে দিয়েছেন নানাভাবে। যে-কোন দিন বলবেন।"

"তুমি কি বলেছ?"

"আমি প্রথম দিকে বলেছি যে আমি সংসারে ঢুকতে চাই না। তারপর আর কিছু বলিনি।"

"তোমার কি ইচ্ছা ?"

অমৃতা মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল, "আপনার আদেশ ছাড়া ত আমি কিছু করব না। আমার তাকে ভালো লাগে; কিন্তু মনকে সরিয়ে নেবার শক্তি আমার আছে। যদি তাতে আপনার মত থাকে।"

মহারাজ চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভিতরটা তোলপাড় হতে লাগল। ডঃ রাও সব দিকে উপযুক্ত। তাঁর প্রশংসা তিনি শুনেছেন।

কিন্তু—।

মাঝখানে যে একটা মস্ত বড় কিন্তু থেকে যাচ্ছে। যে কথা না বলেই সারদাদেবী মারা গেছেন, সে কথা কি অজানাই থেকে যাবে ? যার কথা, সে জানবে না ?

তিনিই এখন পৃথিবীতে একমাত্র লোক যিনি সব সত্যটা জানেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হয়ে যাবে। এতদিনই যখন অমৃতা জানল না, না জেনেই যখন এতটা পথ নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসেছে, তখন বাকি পথটাও পেরিয়ে যেতে পারবে।

তবে তাই হোক।

কি দরকার পাঁক থেকে কাদা তোলার ? কাদার উপরে যে কুমুদ ফুল ফুটে আছে, তাই দেখুক সবাই আর কুমুদ ফুলও মনের খুশীতে সুন্দর শোভা ছড়িয়ে দিক সবার মধ্যে। চাপা থাক তার পাঁক পঙ্কিলতা।

আবার স্বামীজীর অন্যদিকটা মনে এলো। অমৃতা আর কতটুকু পথ এগিয়েছে; এখনও যে রয়েছে অফুরন্ত পথ।

তিনি দেহ রাখার পরে যদি কোনদিন কোন ভাবে সত্য বেরিয়ে আসে, অমৃতা একা কি পারবে তা সহ্য করতে ? তার চাইতে সত্যেরই হোক জয়।

সে সংসারে প্রবেশ করবার কথা ভাবছে। এখনই সময় তাকে

সবকিছু খুলে বলার। তার যা বয়স হয়েছে ও যে শিক্ষা সে পেয়েছে, নিজের উপর নিজে দাঁড়াবার শক্তি তার হওয়া উচিত।

তাছাড়া তিনি রয়েছেন পাশে।

সব জানার পরে যদি কৃষ্ণ রাও ওকে গ্রহণ করতে রাজি হয় তবেই হবে সেটা সত্যিকার গ্রহণ করা।

বালুচরে ঘর বাঁধার চেষ্টা বড় ভুল। তা ভেঙে গেলে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলে মানুষ। তাই ঘর যদি বাঁধতে হয়, তার বুনিয়াদ হওয়া দরকার শক্ত। না হলে পথের লোক পথে থাকাই ভালো।

"কি এত ভাবছেন, মহারাজ? আপনার পছন্দ নয় ডঃ রাওকে?"

একটু পরে অমৃতা আবার বলল, "ঠিকই আছে। আমি তবে আস্তে আস্তে সরে যাব তাঁর পথ থেকে। প্রথম একটু কষ্ট হবে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে। সময় কারও জন্য বসে থাকে না।"

"না অমৃতা, আমি তা ভাবছি না। ডঃ রাওর কথা সবার কাছ থেকে যা শুনছি, তাতে মনে হয় সে তোমার উপযুক্ত। তবে একটা কিন্তু আছে।"

"আপনি কি বলতে চান মহারাজ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"তুমি ত জান অমৃতা, সীতাকে রাজা জনক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন মা মাটির বুক থেকে। সীতা সাধারণ মেয়ে ছিলেন না। তিনি ছিলেন এই মা মাটির মেয়ে। তাই রাজা জনক নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আর দশটা মেয়ের মতোই ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সীতা দেবীর পাণিপ্রার্থীর জন্য রেখেছিলেন এক অজেয় ধনুক যাকে মাত্র রামচন্দ্রই পেরেছিলেন বাঁকাতে।"

"মহারাজ, আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"কোনদিন কি তুমি ভেবে দেখেছ তোমার নাম অমৃতা কেন রেখেছি?"

"হাঁ মহারাজ, ছোট থেকেই শুনেছি, আশ্রমের স্বামীজীরা বলতেন

—তুমি চারদিকে অমৃত ছড়িয়ে যাবে, তাই মহারাজ তোমার নাম দিয়েছেন অমৃতা।"

"সেটা কিছুটা ঠিক হলেও সম্পূর্ণ ঠিক নয়।"

অমৃতা মহারাজের এই হেঁয়ালিপূর্ণ কথা ঠিক বুঝতে পারছিল না। চুপ করে ভাবছিল—মহারাজ ত এ-রকমভাবে ঘুরিয়ে কখনও কথা বলেন না।

মনটা যেন অমৃতার হঠাৎ কি রকম করে উঠল। মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হোল না। মহারাজের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল।

"তবে শোন। তোমার জানবার সময় এসেছে। তুমি 'অমৃতস্য পুত্রী'—তাই তোমার নাম রেখেছি 'অমৃতা'।"

"মহারাজ, সকলেই ত অমৃতস্য পুত্র—পরমব্রহ্মের সন্তান ত সকলেই।"

"তা ঠিকই তুমি বলেছ। তবে একটু তফাৎ আছে। সীতা দেবী যেমন ধরিত্রীর সন্তান, মাটির থেকেই তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন রাজা জনক, ঠিক তেমনই তোমাকে আমি তুলে নিয়েছিলাম মা ধরিত্রীর বুক থেকে।"

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "সেই সকালটা অন্য সব সকালের চাইতে ছিল একেবারে আলাদা। মিষ্টি হাওয়া বইছিল। আধো আলো আধো অন্ধকারের ভিতর আমি হাঁটছিলাম। যাকে বলে আলো-আঁধারির সন্ধিক্ষণ। হঠাৎ দেখলাম স্বর্গের একটি পারিজাত ফুল কি করে জানি খসে পড়েছে এই মর্ত্যের বুকে। তুলে নিলাম বুকে। এই স্বর্গের ফুল ত সংসারের আবহাওয়াতে বাঁচতে পারবে না। তাই দিয়ে দিলাম সারদার কাছে। সে মানুষের রূপে দেবীই ছিল। সেই হবে তোমার উপযুক্ত মা।" মহারাজ চুপ করলেন।

"সে কি মহারাজ? এতকাল যাবৎ যা শুনেছি, তা সবই মিথ্যা?

আমি আমার মা'র কেউ নই ? আমার কোনো সত্যিকারের পরিচয় নেই ?"

"তোমার সবচাইতে বড় পরিচয় তুমি ঈশ্বরের সন্তান। আর একটা কথা, যা তুমি জান তা আবার বলছি—যে পালন করে সে জন্মদায়িনীর চাইতেও বড়। যে জন্ম দেয় তার কষ্ট একবার, যে পালন করে তার কষ্ট প্রতি মুহূর্তে, প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর। আমাদের শাস্ত্রেই আছে—এই দুই মা-ই সমান। একজনের মাঝে অনেকে দু'জনকে পায়।"

অমৃতা মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ বসে রইল। যদিও সে আশ্রমে মানুষ, সারদা দেবীর মতো মায়ের কাছে মানুষ, মহারাজের স্নেহে পালিত, তবুও মনের ভেতরটা কেমন যেন হয়ে গেল।

হঠাৎ মনে হোল তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, চোখের সামনে থেকে আলো নিভে যাচ্ছে। যার উপর সে দাঁড়িয়ে ছিল, তা সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মহারাজ তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। ধীরে ধীরে তার মাথার উপর হাতটা রাখলেন।

"তোমার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, মহারাজ সব সময় বলেছেন ও বলেন—সত্যের উপর সব সময় দাঁড়িয়ে থাকবে। তার থেকে কখনও সরে দাঁড়াবে না। এখনও আমি তাই বলি। ঈশ্বরের সন্তান আমরা। তার চাইতে বড় পরিচয় আমাদের নেই। এই সমাজে তার চাইতে ছোট পরিচয়কে বড় করে ধরা হয়েছে বলেই না আজ পৃথিবীতে এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত পাপ, এত অনাচার। মানুষের তৈরি এই শৃঙ্খলটা বড় নয়, অমৃতা। তবে এটা ঠিক, স্বর্গের পারিজাতকে বাঁচাবার জন্য এই পথ আমি ও তোমার মা বেছে নিয়েছিলাম।" মহারাজ একটু থামলেন।

"ঠিক করে রেখেছিলাম, সময়ে তোমাকে সব বলে যাব। আজ তুমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ। সারদার মতো মায়ের কাছে বড় হয়েছ।

আমার স্নেহ পেয়েছ। সবার উপরে তুমি আগের জন্মের পুণ্যের জোরে এমন অমলিন স্বভাব পেয়েছ। তুমি সীতার মতো। তাই তোমাকে যে যাজ্ঞা করবে, তাকে হতে হবে রামের মতো। তবেই সে হবে তোমার উপযুক্ত।"

এতক্ষণ পরে অমৃতা মাথা তুলে তাকাল মহারাজের দিকে। মনে হোল তাঁর চোখ মুখ দিয়ে যেন কি এক আলো বেরিয়ে আসছে।

"মহারাজ, প্রথম সব শুনে মনটা যেন কেমন করে উঠেছিল। আমি পরিচয়হীনা। আমি কি করে সবার কাছ থেকে পালিয়ে যাব, কোথায় লুকাব। কিন্তু আপনার সব কথা শোনার পরে সে দ্বন্দ্ব আমার ঘুচে গেছে। আমি 'অমৃতস্য পুত্রী'। দেবীর মতো মায়ের কাছে মানুষ হয়েছি। ভগবানের প্রতিভূ আপনি, তাঁর স্নেহের ছায়ায় বড় হয়েছি। আমার মতো ভাগ্যবতী কে আছে? ঠিকই বলেছেন আপনি।"

"যাক্ তুমি সব বুঝতে পেরেছ। আমি জানতাম তুমি পারবে। না হলে যে স্বর্গ থেকেও সারদা তার ব্যর্থতায় আঘাত পেত। এখন তুমি যা ঠিক বোঝ, তাই করবে। আমার কিছু বলবার নেই।"

"আমি মন স্থির করেছি। আগের সঙ্কল্প আমি রাখব। মানে বিয়ে না করে সেবাধর্মই আমি গ্রহণ করব।"

"সংসারে থেকেও ভগবানে মন রাখা যায়, বাইরে থেকেও যায়। যদি ডঃ রাও সব জেনে তোমাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন, আমার আপত্তি নেই। তুমি ভেবে দেখ।"

অমৃতা আস্তে আস্তে উঠে পড়ল।

"রাত হয়ে এলো, মহারাজ। আমি যাই। আপনাকে সব আমি জানাব। প্রতিটা কথা।"

প্রণাম করতেই মহারাজ বুকের কাছে মাথাটা টেনে নিলেন, "অমৃতা, তুমি অমৃত ছড়িয়ে, শান্তি সুখ ছড়িয়ে দাও চারিদিকে, এই প্রার্থনা। নিজে পাওয়াটা ত সামান্য জিনিস, পরকে দেওয়াটাই সবচাইতে বড় কর্ম ও ধর্ম।"

॥ নয় ॥

নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গাতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন অমৃতা এলো না, তখন ডঃ রাও ধীরে ধীরে ফিরে চললেন।

আজকে বড় আশা করে এসেছিলেন তাঁর মনের ইচ্ছার কথা অমৃতাকে জানাবেন।

তিনি বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ অনেক ভেবেছেন। চট করে কোনো কিছু স্থির করার লোক তিনি নন।

তাঁর মধ্যে রয়েছে দুটি সত্তা। বাইরেটা যেমন প্রাণোচ্ছল, ভিতরটা তেমনি স্থির অচঞ্চল। পড়াশুনার মধ্যেই ডুবে থাকবেন, আর থাকবে তাঁর ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধুবান্ধব। এই জীবনটাই নিয়েছিলেন বেছে।

অমৃতাকে দেখবার পর থেকে যেন মনটাতে অন্য ভাব দেখা দিল। হ্যাঁ, অমৃতাই তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী। তাকেই তিনি বুঝি এতদিন খুঁজছিলেন। ওকে পেলে তাঁর সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন।

প্রথম মনে হয়েছিল, স্বভাব দু'জনের আকাশ-পাতাল তফাৎ। আস্তে আস্তে বুঝলেন, বাইরের আবরণটাই যা তফাৎ। অন্তরটা একই। চিন্তাধারা জীবনধারাতে কোন তফাৎ নেই। কাউকে এ-পর্যন্ত এমনটা দেখেন নি।

আজকে ওকে না দেখে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কালকেও ত ক্লাসে দেখেছেন। ভালোই আছে। তবে?

এলো না কেন?

তিনি এমন কোন কথা কি বলেছেন, যেটা তাকে সরিয়ে দিল? বা এমন কোন ব্যবহার? মনে ত হয় না।

বলবেন শুধু ভাবছিলেন। তবে?

ক্লাসে ত তাকে ধরা যাবে না। তাছাড়া ক্লাসের শেষে এক মিনিটও ত ও দাঁড়ায় না? কারো সামনে ত কথা বলা ঠিক হবে না।

ডঃ রাও বেশ ক'দিন অমৃতাকে একা ধরতে চেষ্টা করে না পারায় বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। সৎমা আসার পর থেকেই সংসারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। বই ছিল তাঁর সঙ্গী, বই ছিল তাঁর প্রাণ। সেদিক থেকে ভগবান তাঁকে অকৃপণ হাতে দিয়েছিলেন। পরীক্ষার পর পরীক্ষা তিনি ভালোর চেয়ে ভালো করছিলেন।

তারপর এলো আমেরিকা যাবার আমন্ত্রণ। ব্যক্তিগত জীবনের না পাওয়াটা আস্তে আস্তে ছোটর চেয়ে ছোট হতে লাগল। শেষে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

রয়ে গেল একটা মাত্র সূত্র। কর্তব্য। সেটা পুরোপুরি করেছেন। সপ্তাহে একটা চিঠি ও মাসান্তে মোটা টাকার অঙ্ক গিয়ে পৌঁছেছে জন্মদাতাব কাছে।

অমৃতাকে দেখার পর থেকে যেন মনে হচ্ছিল কর্তব্য ছাড়াও আরও কিছু আছে এই পৃথিবীতে—স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা। এসব একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দিন গুনতেন ছুটির দিনের সকালটার জন্য। অমৃতা আসবে নির্দিষ্ট জায়গাতে। দু'জনে পাশাপাশি হাঁটবেন বা বসবেন।

কখনও কথা বলবেন, কখনও বোধহয় যে যার চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকবেন। যদিও সান্নিধ্যের আবেশটা রয়ে যাবে দু'জনের মনে।

মনে মনে কত কল্পনা করেছেন ডঃ রাও অমৃতাকে নিয়ে। যে লোকটা কথার সাগর, আসল জায়গাতে এসে কেমন যেন হয়ে যেতেন।

তাই, বলি বলি করেও বলা হয় নি কিছুই।

কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন, অমৃতাকে ছাড়া তাঁর চলা কঠিন হবে। এটাও বুঝতেন, অমৃতা এমনভাবে মানুষ হয়েছে

যে সংসারে থেকেও সে সংসারের বাইরে থাকতে পারবে। সে অন্তর্মুখিনী। তার যে মানসিক শক্তি আছে, সেটা কি তাঁর আছে?

এটা তিনি কি করলেন?

উজাড় করে নিজেকে বিলীন করে দিলেন একজনের মধ্যে যাকে কিছুই বলা হয় নি। এখন সে কি করবে?

তাঁর যেমন করে হোক অমৃতাকে ধরতে হবে, বোঝাতে হবে, তাকে ছাড়া এখন আর নিজের বলে কিছু নেই।

এ প্রথম যৌবনের পাগলামি নয়। এ শুধু দেহের আকর্ষণ নয়। এ হচ্ছে মনের সঙ্গে মনের মিল।

বোঝাতেই হবে অমৃতাকে, সে যেমন ভাবে চলতে চায় তাতে কোনো ব্যতিক্রম করবার দরকার নেই। সে যদি চায়, ওঁকে মহারাজের শিষ্য হতে হবে, তিনি তাতে প্রস্তুত।

কিন্তু তিনি একলা ওকে কি করে পাবেন?

মেয়েদের হোস্টেলে তিনি যেতে পারেন না। তাতে অমৃতাকে ছোট করা হবে। তিনি তা কখনও করতে পারেন না। ভালোবাসার পাত্রীকে সবার সামনে সবার উপরে দেখাবার ইচ্ছাটাই ত স্বাভাবিক।

নানা চিন্তায় রাতের পর রাত জেগে কাটাতে লাগলেন। অমৃতার ত এমন কোন বন্ধু নেই, এমন কোন আত্মীয়-পরিজন নেই যার কাছে যেতে পারে, যার কাছে মনের কথা খুলে বলতে পারে।

সবারই নজরে পড়তে লাগল, এত হাসি-খুশী মানুষটা যেন গম্ভীর হয়ে পড়ছে। সবার আগে অমৃতার চোখেই তা পড়েছে।

তার অন্তর ব্যথায় ভরে গেছে নিজের জন্য ও ডঃ রাওর জন্য। কিন্তু সে উপায়হীনা। জোর করে তার নিজের সঙ্কল্পে থাকতে হবে অটুট।

মহারাজের কাছে গিয়ে বসতেই একদিন প্রশ্ন করলেন মহারাজ, "কি অমৃতা তুমি ত আমাকে কোন কিছু বল নি এতদিনের মধ্যে? বলেছিলে বলবে।"

"বলার কিছু ঘটে নি, তাই বলিনি।"

"মানে ?"

"আমি আর ডঃ রাওর সঙ্গে দেখা করিনি।"

"তাঁর মধ্যে কি কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ ?"

"দূর থেকে আমার মনে হয়, উনি দুঃখ পাচ্ছেন।"

"সব বলে দেখলে কেমন হোত ?"

"কী দরকার, মহারাজ! সবই সহনীয় হয়ে যায়। সময়ে উনি তাঁর পথ পাবেন।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমাকে যে বড় ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট দেখছি, অমৃতা। আমি তোমাকে লক্ষ্য করছি, আর ভাবছি আমি কি কিছু ভুল করলাম ? আমি ত মানুষ।"

"না মহারাজ, আপনি ঠিকই করেছেন। মনে আমার আঘাত লেগেছে ঠিকই। এটাও ঠিক, আপনার শিক্ষা আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। আমার জন্য ভাববেন না।"

মহারাজ আর কিছু বললেন না। এর যে কিভাবে সমাধান হবে তার কোন হদিশ তিনি পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ সেই সমাধানের পথ দেখা গেল। অনেক ভেবে চিন্তে. অনেক দিন অপেক্ষা করার পর ডঃ রাওর মনে হোল, তাই ত। অমৃতার কথা মহারাজের কাছে গেলে জানতে পারা যাবে। বলতে গেলে উনিই ত ওর গার্জিয়ান।

এই অতি সাধারণ কথাটা তাঁর মনে আসে নি কেন ?

মানুষ বেশী চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়ে যখন হাবুডুবু খায়, এই রকমই বুঝি দিশেহারা হয়ে যায়। সহজ, সোজা কথাটাও মনে আসে না। .

ডঃ রাও মনে মনেই হাসলেন। এই বয়স পর্যন্ত তাকে সকলে বুদ্ধিমান বলেই মনে করেছে। এখন দেখলেন তার বুদ্ধির দৌড়। মানে, উপস্থিত বুদ্ধির সত্যিই অভাব।

একটা ইংরেজী প্রবাদ মনে পড়ে গেল—“কমনসেন্স”, মানে সাধারণ বুদ্ধিকে যদিও সাধারণ বলা হয়; কিন্তু তা মোটেই 'কমন' বা সাধারণ নয়। ছুনিয়াতে যত অভাব এটারই। কে যে পরিহাস করে এটা চালু করেছিল! এটার অভাবই ত সংসারের অর্ধেক ছুর্ভোগের কারণ।

অনেক ভেবে চিন্তে ডঃ রাও গিয়ে উপস্থিত হলেন আশ্রমে। মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী। মাদ্রাজে তাঁর কথা পণ্ডিত ও ভালো লোক বলে বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বামীজীরা সকলেই তাঁকে নামে চিনতেন চাক্ষুষ আলাপ না থাকলেও।

আর এদিকে মহারাজের মনও বলছিল, একদিন ডঃ রাও নিজেই আসবেন তাঁর কাছে।

এই পর্যন্ত তিনি দেখেছেন তাঁর মনে যা হয়, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তা ঘটে। সারা জীবনের ব্রহ্মচর্যের এটা বোধহয় একটা ছুর্লভ শক্তি।

“আস্থন, ডঃ রাও,” কৃষ্ণ রাও ঘরে ঢুকতেই সাদরে মহারাজ তাঁকে ডেকে কাছে বসালেন।

ডঃ রাও প্রণাম করে বসতেই মহারাজ বললেন, “কদিন থেকেই ভাবছিলাম, আপনাকে লেকচার দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাব। ভালোই হোল, আপনি নিজেই এসেছেন। আপনার মতো স্থপণ্ডিতের ভাষণ শুনবার জন্য সকলেই আগ্রহী।”

“কি যে বলেন, মহারাজ। আমি আর এত অল্প সময়ের মধ্যে কি বা জেনেছি। এ ত প্রথম সোপান। সারা জীবনের সাধনাতেও যদি কিছু জানতে পারি, সেই আশীর্বাদ করবেন মহারাজ।”

“বিদ্যা বিনয় দান করে। আপনার কথাতেই তার প্রমাণ। ঈশ্বর আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।”

কৃষ্ণ রাওর মনের মধ্যে সমানে অমৃতার কথা, কিন্তু বাইরে নানা আলোচনা হতে লাগল। আসল কথাতে যেন কিছুতেই আসতে পারছেন না। গলার কাছে কেন যেন তা যাচ্ছে আটকে।

কিসের থেকে আরম্ভ করবেন, কোন্ সূত্র ধরে করবেন শুরু, তার কোন হদিশ পাচ্ছেন না।

মহারাজ মনে মনে সবই বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু তিনি চাইছিলেন কৃষ্ণ রাও নিজের থেকে বলুন।

অমৃতার কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন, অমৃতা ডঃ রাওকে এড়িয়ে চলছে। বুঝেছিলেন ছু'জনে ছু'জনে প্রতি ভালোবাসার কথা। আর এও বুঝেছিলেন, তাতে কোন খাদ নেই।

ডঃ রাওকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে তিনি এই বিষয়ে প্রায় স্থিরনিশ্চিত হলেন।

মনে মনে তিনি একটু ছুঃখ পাচ্ছিলেন, অমৃতা কেন সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারছে না।

কেন ?

তার এত দিনের শিক্ষা কি তবে ব্যর্থ ? সারদা দেবীর মনের জোর কি মেয়ে পায় নি ?

আবার ভাবলেন, এও ত হতে পারে, সোজাসুজি সংসারে ঢুকবে কিনা সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসায় বোধহয় এখনও আসতে পারে নি। বাইরে ছু'জনে নানা বিষয়ে গভীর আলোচনা করছিলেন। কিন্তু মনের মধ্যে ছু'জনেরই ভাবনা ছিল একেবারে বিপরীত।

কখন, কি করে শুরু করি আসল কথা—ডঃ রাওর চিন্তা, আর মহারাজ ভাবছেন কখন রাও আসল কথায় আসবেন।

ডঃ রাওর মনে আরও একটা ছুর্ভাবনা ছিল, হঠাৎ যদি অমৃতা এসে পড়ে। ও ত এখানকার মেয়ের মতো যখন-তখন এসে পড়ে। তখন কি হবে ?

আর তা হলে বলা হবে না।

এতদিন ধরে মনের মধ্যে ভাবনা নিয়ে উনি আর যেন পেরে উঠছিলেন না। তাই ত মহারাজের শরণাপন্ন হয়েছেন।

জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাকে এগুতে হয়েছে।

পাশে দাঁড়াবার মতো কাউকে পান নি। সব বাধা সত্ত্বেও এগিয়েছেন। সেই জন্যই বোধহয় ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাই ত আজ সাহস করে এসে দাঁড়িয়েছেন মহারাজের মুখোমুখি।

তাঁর জানতে হবে সব কথা। হঠাৎ কেন অমৃতা তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ এমন কি হোল? কি এমন হতে পারে তাঁর অজান্তে?

মহারাজই একমাত্র লোক যাঁর কাছ থেকে সঠিক কথা জানতে পারবেন। তাই হঠাৎ ডঃ রাও আর চেপে থাকতে না পেরে অন্য কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন, "মহারাজ, আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে। সেটা যদি অনধিকারচর্চা মনে করেন তবে মার্জনা করবেন।"

"আমি ভালো করেই জানি আপনার মতো লোক অন্যায় প্রশ্ন কখনই করবেন না। বলুন আপনি, কি আপনার প্রশ্ন? কোনো দ্বিধা করবেন না। মানুষের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার চেষ্টা, তাদের মনে শান্তি দেওয়াই ত আমাদের কাজ। আমাদের গুরুদেব তাই আমাদের বলে গেছেন। তাই আমাদের মন্ত্র, তাই আমাদের ধর্ম। বলুন ডঃ রাও, কি কথা আপনাকে ব্যথিত করছে?"

"মানে, অমৃতা ত বলতে গেলে আপনাদের আশ্রয়ে মানুষ।"

বাধা দিয়ে মহারাজ বললেন, "সারদা দেবী তাকে মানুষ করেছেন। অমৃতা আমাদের স্নেহের পাত্রী।

"হ্যাঁ, মহারাজ, আমি তাই বলতে চাইছিলাম। মানে ও আমার ছাত্রী। আমার কথা কি ও আপনার কাছে কিছু বলে নি?"

"হ্যাঁ, বলেছি বৈকি। আমাকে ও সব কথাই বলে। বিশেষ করে সারদা মারা যাবার পর থেকে কোনো কিছুই সে আমার কাছ থেকে গোপন করে না।"

"তবে ত আমার বলাটা অনেক সহজ হয়ে গেল। ওর কাছে

আমিও শুনেছি, মা মারা যাবার পর থেকে আপনিই ওর একমাত্র আপনজন।”

মহারাজ কোনো উত্তর না দিয়ে মন দিয়ে কথা শুনে যাচ্ছিলেন। আর কৃষ্ণ রাওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁকে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন।

খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন, অমৃতার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা আর এটাও বুঝেছিলেন, এ হচ্ছে অমৃতার উপযুক্ত। সব দিকে, বিশেষ করে মনুষ্যত্বে।

সারা জীবন তিনি কত লোকের সান্নিধ্যে এসেছেন। কিন্তু এরকম কমই দেখেছেন।

ডঃ রাও বলতে লাগলেন, “আমরা কিছুদিন হোল অনেকটা কাছাকাছি এসে, মানে দেখাশোনা করে মনে হয়েছে আমাদের মনের মিল আছে। ওর মতো মেয়ের আমি ঠিক নিশ্চয়ই উপযুক্ত নই। সেই কথাই বোধহয় ও বুঝতে পেরেছে। সেইজন্য বেশ কিছুদিন হোল ও আমাকে এড়িয়ে চলছে। মহারাজ, বিশ্বাস করুন, আমার ওকে কোনো কথাই বলা হয় নি। ভেবেছিলাম বলব, চাইব ওকে জীবনসঙ্গিনী রূপে। সে সুযোগ আর হোল না। ক্লাসে দূর থেকে দেখি। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে কথা বললে নানা কথা হতে পারে। তা ত আমি করতে পারি না। তাই আপনার কাছে আসা।”

“আপনি ঠিক কি জানতে চান?”

“ও কেন আমাকে এড়িয়ে চলছে। আমি বলতে চাই, আমি যদি তার উপযুক্ত নাও হই, আমি চেষ্টা করব হতে। চেষ্টা করলে অনেকটা এগুনো যায়। কি বলেন মহারাজ?”

“নিশ্চয়ই। আপনি কিন্তু এখনও ঠিক কি বলতে চাইছেন, তা বলেন নি।”

“ঠিক বলেছেন মহারাজ। আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন। আমি আপনার স্নেহের পাত্র।”

"ঠিক আছে। তাই হবে।" মহারাজ উৎসুকভাবে তাঁর দিকে তাকালেন।

"মানে, আমি অমৃতাকে বিয়ে করতে চাই। এতদিন ভেবেছিলাম জীবনে বিয়ে করব না। পিছুটান আমার বলতে গেলে কিছু নেই। পড়াশুনা করে, পড়িয়ে জীবনটা কাটাব। জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তাতেই একটা জীবন কেটে যাবে। ওকে জানবার পর মত বদলেছি। এখন আমি কি করব মহারাজ ?"

॥ দশ ॥

"ওর কথা কি তুমি সব জান ?"

"হ্যাঁ। ওর কাছেই শুনেছি। সারদা দেবী যদিও তাকে পালন করেছেন, যদিও তাঁকেই ও মা বলে জানে, সত্যিকারের মা উনি নন।"

"আর কিছু শোননি ?"

"সবই শুনেছি। ও জন্মাবার আগে ওব বাবা, মানে সারদা দেবীর এক অতি দূর সম্পর্কের দেওর মারা যান। ওর যখন বয়স মাত্র মাসখানেক, ওঁর জা ওকে রেখে মারা যান।"

"সারদা দেবীর কথা ত তুমি সবই নিশ্চয় শুনেছ।"

"সবই শুনেছি, মহারাজ। তিনি সংসারে থেকেও ছিলেন সন্ন্যাসিনী। তাই মনে হয় অমৃতারও মাটির সঙ্গে সংযোগটা একটু বুঝি আলগা।"

"তুমি ঠিকই ধরেছ ওকে। ও তার সারদামায়ের মতোই হয়েছে।"

"খুবই স্বাভাবিক। জন্মাবধি যাঁর কাছে, তাঁর মতো হওয়াটা।"

"একথা তুমি বিশ্বাস কর কৃষ্ণ, যে পালন করে তার ধারাটাই বেশী করে মানুষকে আচ্ছন্ন করে ?"

"সেটাই ত স্বাভাবিক। তিলে তিলে যার কাছে বেড়ে ওঠে, তার অনুভূতি, তার সবকিছু প্রভাবিত করবে।"

"তুমি বলতে চাইছ, তার বাবা-মা কে বা কি ছিল, সেটা তেমন বড় কথা নয়।"

"ঠিক তাই। কিছুটা তাঁদের প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু পালিতা মা'র প্রভাবই ত অনেক, অনেক বেশী পড়বে।"

"তুমি তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস কর?"

"হ্যাঁ। এর মধ্যে অবিশ্বাসের কি থাকতে পারে? তাছাড়া আমাদের হিন্দু ধর্মেই ত যিনি পালন করেন তাঁকে জন্মদায়িনীর সঙ্গে একই আসনে বসিয়েছে।"

একটু থেমে ডঃ রাও হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, হঠাৎ আপনি এই কথা এমনভাবে কেন আলোচনা করছেন? আমি ত এসব সবই জানি।"

"আমি যদি বলি, তুমি অনেকটাই জান না! আমি যদি বলি অমৃতার বাবা দুশ্চরিত্র, মাতাল ও নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন? তুমি কি বলবে—তাতে কি এসে যায়? আমি ত অমৃতার পাণিপ্রার্থী। তার যা বয়স, তার একটা নিজস্ব সত্তা গড়ে উঠেছে। তাকে আমি চিনি, জানিও তাই আসল। তার পিছনে ফেলে আসা অতীত আমার কাছে শুধু অতীত। বা তা অস্তিত্বহীন।"

মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

একটু পরে আস্তে আস্তে বললেন, "ধর, তার মা যদি পদস্খলিতা হন। সেটা তুমি কিভাবে নেবে?"

ডঃ রাও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন—মহারাজ কি বলতে চাইছেন?

অমৃতার জন্মরহস্য যেন সত্যিকারেরই এক অজানা রহস্যাবৃত। তাকে আস্তে আস্তে খুলে ধরতে চেষ্টা করছেন মহারাজ।

কেন তিনি বুঝতে পারছেন না যে তার কাছ অমৃতার

পারিপার্শ্বিক বড় নয়। অতীতের কথা জানবার তার কোনো আগ্রহ নেই।

কে, কি ভাবে জন্মায়, কোথা থেকে আসে, আসাটাই যে সবটুকু নয়, তার প্রমাণ ত কৃষ্ণ রাও নিজেই।

যেখান থেকে উনি এসেছেন, সেখানে বিদ্যার স্থান নেই। সরস্বতী সেখানে অবহেলিত। লক্ষ্মীর সাধনাই তাঁদের মূলমন্ত্র। আর নিজের স্বার্থ ছাড়া তারা কিছু ভাবে না।

ভালো-মন্দের বিচার তিনি করতে চাইছেন না। শুধু তাদের সঙ্গে তাঁর মিল কিছুই নেই। তাই তাঁর জীবন দিয়ে বুঝেছেন, যে যারটা নিয়ে আসে। জন্মটা অনেক সময়ই একটা অ্যাক্সিডেণ্ট।

"তুমি আমার শেষের উত্তরটা এখনও দাওনি।" মহারাজ বললেন।

"একই উত্তর। আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি মানুষই তার অতীত জন্মের সংস্কার নিয়ে জন্মায়। তাই দেখা যায়, সাধুর ছেলে ডাকাত। আবার ঠিক উল্টোটা। তাই জন্মটা বড় নয়, মানুষটা বড়।"

"তুমি যখন এই কথা বললে, তবে শোন সব কথা। আমি নাম রেখেছি অমৃতা। সে 'অমৃতস্য পুত্রী'। সে স্বয়ং ব্রহ্মার সন্তান। তাকে আমি কুড়িয়ে পাই এক স্বর্গীয় আধো আলো, আধো অন্ধকারের সকালে। পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম নিষ্পাপ শিশুকে।"

একটু থেমে মহারাজ বললেন, "শিশুর উপযুক্ত দেবীর মতো মা'র হাতেই তুলে দিয়েছিলাম। সারদা সত্যিই তাই ছিল। বড় স্নেহের শিষ্যা আমার। ওর স্বামীও ওর মতই ছিল এবং আমার শিষ্য ছিল। যে পরিচয় সবাই জানে, তা মিথ্যা।"

আবার একটু থেমে মহারাজ শুরু করলেন, "এই কঠিন সংসারের আঘাত থেকে শিশুটাকে বাঁচাবার জন্য, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করবার জন্য এই মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। সারদা আমাকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করত। তাই সে এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়েছিল। সে ছিল নিঃসন্তান। সন্তান স্নেহে অমৃতা

মানুষ হয়েছে। তাছাড়া তার আগের জন্মের পুণ্যের জোরেই সে এমন মায়ের আশ্রয়ে এসে পড়েছিল। এই পৃথিবীতে আমি ও সারদা ছাড়া তৃতীয় কেউ এই কথা জানত না। অমৃতাও নয়।” মহারাজ থামলেন।

কৃষ্ণ রাওর চোখের সামনে থেকে আস্তে আস্তে একটা পাতলা পর্দা সরে যাচ্ছে। অমৃতা কি কিছু জেনেছে এই কথা? তাই কি সে তাঁর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে?

তাঁর মনটা ব্যথায় ভরে উঠল। একদিকে অমৃতার জন্য কষ্ট। অন্যদিকে নিজের জন্য। অমৃতা তাঁকে কিছুই চিনতে পারে নি। বুঝতে পারে নি এতটুকু। একি কম কষ্টের কথা যাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, সে তাকে চেনে না, জানে না, বোঝে না।

“কি ভাবছ কৃষ্ণ? এখন বুঝলে ত কেন অমৃতা তোমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে? এতদিন পর্যন্ত ও কিছু জানত না। আমিও বোধহয় ঠিক এখনই সব খুলে বলতাম না। তবে এটা ঠিক, মৃত্যুর আগে সত্যটা জানিয়ে যেতাম। তোমার কথা যেদিন আমাকে সে বলে, সেদিনই আমি তাকে সব বলি।”

“এখন বুঝতে পারছি কেন সে আমাকে এড়িয়ে চলছে।”

“আমি এটাও বলেছি তুমি হচ্ছ সীতার মতো। সীতাকে রাজা জনক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তোমাকেও আমি পেয়েছি। তুমি সাধারণের ঊর্ধ্বে। তুমি অমৃতের সন্তান। তোমার উপযুক্ত কি ডঃ রাও? সেটাও ভেবে দেখবার কথা।”

“অমৃতা আপনাকে কি বলেছে?”

“সেও আমাকে ভালোবাসে, তবে মনে হয় এখনও মনস্থির করতে পারে নি সংসারে ঢুকবে, না সংসারের বাইরে থেকে সকলের সেবায় জীবন কাটাবে।”

কৃষ্ণ রাও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

মহারাজও তাকে দিলেন সেই সুযোগ। ভালোভাবে ভেবে চিন্তে এগুনো ভালো। অবশ্য অমৃতাকে ব্যথা দিতে উনি চান না। দুঃখ

পেলেও অমৃতার দাঁড়াবার শক্তি আছে। তিনি তা ভালো করে জানেন।

"তুমি ত সব শুনলে। ভালো করে ভেবে দেখ সব কথা। আমি মনে করি অমৃতার উপযুক্ত হওয়া বেশ কঠিন। তাছাড়া তুমি সংসারের জীব। সংসারের শৃঙ্খলের বাইরে পা বাড়ান শক্ত। আমি কোনো কিছুই মনে করব না যদি তোমার পক্ষে এগিয়ে আসা শক্ত হয়। তবে একটা অনুরোধ, তোমার কাছে—যে কথা তুমি জানলে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন তা না জানে। এই সংসারে অমৃতা ছাড়া তুমি ও আমি জানলাম। আর তুমি ওর দিকে এগিয়ো না; ও বেশী কোনো আঘাত পায় আমি তা চাই না।"

মহারাজ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

এতক্ষণ কৃষ্ণ রাও যেন কেমন আচ্ছন্নের মতো সব শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মহারাজকে উঠে দাঁড়াতে দেখে এই প্রথম মহারাজের পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে বসতে অনুরোধ করলেন।

"মহারাজ, একটু বসুন। আমার যে অনেক কথা রয়ে গেল আপনাকে জানাবার। কত আশা করে এসেছি আপনার কাছে; আমাকে নিরাশ করবেন না।"

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মহারাজের যেন কেমন মায়া হোল। উনি আস্তে আস্তে বসলেন।

"মহারাজ, আপনি শুধু আপনার স্নেহের পাত্রীর দুঃখই অনুভব করলেন, আর আমার কষ্টটার কথা ভাবলেন না। যে অমৃতাকে আমার সবটুকু সত্তা দিয়ে ভালোবেসেছি, সে যে আমাকে এতটুকুও চেনে না, এটা কত বড় আঘাত তা আপনি নিশ্চয়ই অনুভব করবেন। আমি ত তাকে ভালোবেসেছি। তার বাইরে ত আমার কিছু জানবার নেই। আমাকেই দেখুন না।"

এই বলে নিজের জীবনের, নিজের বাড়ির কথা সব খুলে বললেন।

"নিজেকে দিয়েই আমি বুঝেছি সব। আমার কোনো দ্বিধা নেই।

এখন শুধু আমি জানতে চাই, আপনি আমাকে অমৃতার যোগ্য মনে করেন কিনা।"

ডঃ রাও মহারাজের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। মহারাজ একদৃষ্টে কৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে। মনে হচ্ছে যেন শিব হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে দক্ষ রাজকন্যা সতীকে। মুখের ভাবটি এমনই অসহায়। আবার একদিকে শান্ত ভাব।

মহারাজ মন ঠিক করে ফেলেছেন—অমৃতার উপযুক্ত কৃষ্ণ। দু'জনেই দু'জনের যোগ্য।

"আমি ভেবে দেখলাম তোমরা দু'জনেই দু'জনের উপযুক্ত। তোমাদের হোক জয়। আমি অমৃতাকে সব বলব। তুমি তাকে পাবে ছুটির সকালে তোমাদের নির্দিষ্ট জায়গাতে।"

কৃষ্ণ রাও মহারাজকে প্রণাম করে মনে অনেকটা শান্তি নিয়ে ফিরে চললেন নিজের ফ্ল্যাটে।

দুটি ফ্ল্যাট। একতলায় থাকে আর একটি প্রফেসার। কলকাতা থেকে এসেছে। শ্রী ও শ্রীমতী রণেন পালিত। কেমিস্ট্রির প্রফেসার।

ওপরে কৃষ্ণ রাও থাকেন একলা। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই দুটির মধ্যে খুব ভাব জমে গেছে।

"শোন বাণী, কৃষ্ণের কি যেন হয়েছে। আগের হাসিখুশি মানুষটা যেন কেমন বদলে গেছে।"

"ঠিকই বলেছ। আমার চোখেও পড়েছে: আমি তার সবে ধন নীলমণি চাকর ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও সঠিক কিছু বলতে পারে নি, তবে কিছুদিন যাবৎ রাত করে বাড়িতে ফেরে। সকালে বের হয়। কথা একেবারেই বলে না।" বাণী থামল।

"সত্যি, কৃষ্ণ বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। দেশ ছেড়ে এসে মনটা প্রথম খারাপ লাগত। এখন ওকে পে'য় সে ভাবটা একেবারেই কেটে গেছে। নিজের ভাইয়ের বাড়া কৃষ্ণ।"

নিজের ভাই ত কানাডাতে মেম-বৌ নিয়ে মশগুল। মাকে

দু'মাসে একছত্র লিখে দায় শেষ করে। মা-বাবা বর্ধমানে। কৃষ্ণই দুই-এর জায়গা জুড়ে বসেছে।

"ঠিক তাই। না পেরে আমি ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছি, আসতে বলেছি। শুধু দায়সারা উত্তর—ভালো আছি। আসব, আসব।"

"না বাণী, আমার শুধু মনে হচ্ছে—মনের মধ্যে যেন কি চেপে রয়েছে।"

ঠিক এই সময়, "রণেন, দরজা খোল। কি ব্যাপার? কি এত দিনরাত গুজগুজ ফুস্‌ফুস্‌ কর?" বলতে বলতে কৃষ্ণ রাও এসে পালিতের ঘরে ঢুকল।

"বাণী, চা খাওয়াও আর তার সঙ্গে গরম গরম বড্ডা।"

"যাক্‌ বাবা, বরফ গলেছে শেষে। কি ব্যাপার কৃষ্ণ? কিসের তপস্যায় এতদিন ছিলে?" রণেন চেঁচিয়ে উঠল।

"বোঝ না কেন? কোন রাধিকার বোধহয়।" বাণী টিপ্পনী কাটল।

"ভালো হবে না কিন্তু বাণী। চাইলাম চা। আর তুমি দিচ্ছ কথার ফুলঝুরি! কে চায় তোমার কথা শুনতে?"

"কেন, বাণীর কথা এত তেতো হয়ে গেল! মিঠে মিঠে কথা কে ঢালছে কানে কানে?" বাণী বলে উঠল।

"কি মুশকিল, তোমাদের ভাই-বোনের ঝগড়া কি কোনোদিন মিটবার নয়? লক্ষ্মীটি, আগে চায়ের যোগাড় কর।" রণেন বলল।

কিছু না বলে হাসতে হাসতে বাণী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

মাদ্রাজে এসে এদের দু'জনের একেবারেই মন টিকছিল না। সারাজীবন থেকেছে দেশে। সব সময়ই পালাই পালাই ভাব।

এদের ভাষা বোঝা একেবারেই দুর্বিষহ। কৃষ্ণকে পেয়ে দুজনেই বেঁচে গিয়েছিল। বিশেষ করে বাণী ত বাংলা কথা বলতে পেরে সত্যিই কৃষ্ণকে দু'দিনেই আপন করে নিয়েছিল।

কৃষ্ণ রাওর কি করে জানি, আর সবাইকে ছেড়ে-ছুড়ে এদেরই

আপন মনে হোত, এদের সঙ্গেই ছুটির সময়ের বেশীটা কাটাত। মনের সব কথা যেমন রণেন ওকে বলত, ও তেমনি বলত রণেনকে। শুধু এই আসল কথাটাই মুখ ফুটে বলতে পারে নি।

অমৃতার সঙ্গে যে ও ছুটির প্রতিটা সকালে বেড়াতে যায় তা কেউ জানে না।

একদিন বাণী ধরেছিল, "কি ব্যাপার, বল ত, কৃষ্ণ? ছুটির সাত-সকালে কোথায় যাও?"

রণেন অজান্তেই ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। "কেন, হাঁটতে যায়। মনে নেই, ও কতবার বলেছে হার্ভাডে থাকতে খুব ভোরে উঠে বেড়াবার অভ্যেস ছিল। সেটা এখানে এসে ছেড়ে দিয়েছিল। তারই পুনরাবৃত্তি করছে আর কি।"

"তা ত বুঝলাম। কিন্তু শুধু ছুটির সকালগুলো কেন?"

"না, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না, বাণী। অভ্যেস যত ভালোই হোক্ না কেন, ফিরিয়ে আনতে সময় লাগে বৈকি?"

কৃষ্ণকে কোন উত্তর দিতে হয় নি। এদের কৃষ্ণর বড় ভালো লাগে। দু'জনেই সমান তোড়ে কথা বলে। দু'জনেই সিধেসাদা খোলা মনের লোক।

কৃষ্ণ কতবার বলেছে, "জান, আগের জন্মে আমরা খুব আপন ছিলাম। না হলে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই এত টান কেন হো'ল।"

মাঝে মাঝে ওদের তিনজনের মধ্যে বেশ একটা গুরুতর আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। কৃষ্ণ বাণীর ভাই ছিল, না, রণেনের ভাই ছিল।

এই রকম ছিল ওদের মধুর সম্পর্ক।

মহারাজের সঙ্গে কথা বলার পর ডঃ রাওয়ের মনটা বেশ হালকা লাগছিল।

তবুও সে আসল কথা এড়িয়ে গেল, ওরাও আগের কৃষ্ণকে পেয়ে আর ঘাঁটাতে চাইল না। আগের মতো তিনজনে হৈ-চৈ করে খেয়ে যে যার ঘরে চলে গেল।

ছুটির দিনে ডঃ রাও সময়ের বেশ একটু আগেই নির্দিষ্ট জায়গাতে গিয়ে হাজির।

অমৃতার দেখা নেই।

ও কি এলো না? কেন আসবে না? মহারাজ ত বলেছেন, "ও তোমাকে ভালোবাসে।"

॥ এগার ॥

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ দেখল, সময় হয় নি। বেশী আগেই ও এসে পড়েছে। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে অমৃতা এগিয়ে আসছে।

সেই শান্ত, স্নিগ্ধ অমৃতা।

মুগ্ধ চোখে ডঃ রাও তাকিয়ে ছিল।

"চল কৃষ্ণ, আমরা সমুদ্রের দিকে যাই।" এই ছোট্ট কথাটা ডঃ রাওর মনে হোল এমন কথা যেন সে জীবনে শোনে নি। এই একটা কথার জন্য মানুষ সারা জন্ম অপেক্ষা করে থাকতে পারে।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। পায়ে পায়ে কখন যে ওরা এসে সমুদ্রের ধারে বসেছে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি।

অমৃতাই প্রথম কথা বলল, "মহারাজ আমাকে সব কথা বলেছেন। তিনি মত দিয়েছেন।"

"তুমি?"

"কেন, তুমি কি আমার মনের কথা বোঝ নি?"

"তবে কেন তুমি এমন করে সরে গিয়েছিলে?"

"তোমাকে সময় দিয়েছিলাম নিজেকে বুঝতে।"

"আমাকে পরীক্ষা করছিলে?"

অমৃতা চুপ করে রইল।

"বল অমৃতা, আমি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছি কিনা।"

"আমার শুধু একটা কথা বলার রয়ে গেছে। তোমার বাবাকে কি বলবে ?"

"তাঁকে কিছু বেশী বলতে হবে না। সারদা দেবীর মেয়ে শুনলেই তিনি এক কথায় আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। সেটা তিনি অনেকবারই করেছেন। অবশ্য টাকাটা নিতে তাঁর আগেও বাধে নি, এখনও বাধবে না।"

"মার মেয়ে জানলে আপত্তি হবে কেন ?"

"আমরা ভিন জাতের ত। এইসব ভেবে তুমি সরে গিয়েছিলে, অমৃতা ? এই ক'দিন কি মরণ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গেছি, তা কি তুমি জান ?" বলতে বলতে কৃষ্ণ রাও দু'হাত দিয়ে অমৃতার একটা হাত চেপে ধরল।

অমৃতার চোখে জল, "আমারও বড় কষ্ট গেছে। মা যাবার পর এত কষ্ট পাইনি।"

আস্তে আস্তে অমৃতা মাথাটা কৃষ্ণর কাঁধের উপর রাখল। কৃষ্ণ ধীরে ধীরে ওকে কাছে টেনে নিল। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে কারও হুঁশ নেই।

রোদের তাপ গায়ে লাগতে অমৃতা বলে উঠল, "ভাই ত, বেলা হয়ে গেছে অনেক, কেউ যদি দেখে ফেলে।"

"আজ কোনো ভয় নেই। আমার ইচ্ছে করছে সবাইকে ডেকে ডেকে বলি—এই পৃথিবীতেই স্বর্গ। তাই আমরা গড়ব। তোমরা সবাই জান, দেখ।"

অমৃতার কথায় যেন কেমন অন্য সুর বাজতে শুরু করেছে। সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকুমারী যেন প্রাণ পেয়েছে।

"খুব হয়েছে। এখন উঠে পড়। আমার গিয়ে সব বলতে হবে মহারাজকে।"

"আমার গিয়ে সব বলতে হবে মহারাজকে।"

"মানে ?"

"মানে খুব পরিষ্কার। মহারাজ তোমাকে স্নেহ করেন ঠিকই। তবে আমাকেও কিছু কিছু করেন। আমি তোমার থেকে কিছু ভাগ বসিয়ে নিয়েছি।"

দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

একটু দূরে দুটি পাখী ছিল বসে নিবিড় হয়ে। আনন্দের ছোঁয়া তাদেব লাগল। ওরা ডানা মেলে আকাশের বুকে উড়ে গেল।

পরদিন মহারাজের কাছে অনুমতি নিয়ে দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে তিন মাসের নোটিশ দিয়ে এলো। ইণ্ডিয়ান স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে বিয়েতে তিন মাস অপেক্ষা করতে হয়।

এমন খবর বাতাসের আগে উড়ে চলে। কৃষ্ণ কথাটা বলেছিল রণেন ও বাণীকে। তার ত আপন বলতে তারাই। বাণী শুনে লাফিয়ে উঠেছিল।

"অমৃতার ত বলতে গেলে কেউ নেই। আমি হব বরের ঘরেব পিসী ও কনের ঘবের মাসী। কৃষ্ণ, তোমার কিছু ভাবতে হবে না।"

"আমি কিন্তু সোজা বলে দিলাম, কন্যাকর্তা হব।"

রণেন বলেছিল।

ওর সহপাঠিনীরা ত যাকে বলে আকাশ থেকে পড়েছিল।

"পেটে পেটে এত?"

কেউ হয়েছিল খুশী, কেউ হয়েছিল দুঃখিত।

কৃষ্ণ হাতছাড়া হয়ে গেল। কারো বুকে জ্বলেছিল হিংসের জ্বালা।

"মরি মরি, কি বা রূপ! তার উপর তিন কুলে কেউ নেই। পুরুষগুলো কি রকম হ্যাংলা, না রে?"

"তা কেন, অমৃতার মতো মেয়ে ক'টা হয়? আমাদের চোখেই পড়ে না।"

"তোদের মতো চোখ ত ডঃ রাওর। তাই ত এই দশা।"

নানা জনের নানা কথা অমৃতার কানে গিয়ে যে পৌঁছাত না তা

নয়। কিন্তু ও ত আর সেই শান্ত মেয়েটি নেই। তার মধ্যেও যেন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। মনটা কৃষ্ণর ভাবনায় ভরে থাকে।

রাতে মা'র কথা মনে হয়। বেঁচে থাকলে কত শান্তি পেতেন।

অমৃতা প্রায়ই এখন বাণীদের কাছে যায়। ওখানে কৃষ্ণর সঙ্গে দেখা হয়।

একদিন বাণী বলল, "কি আমার কনেকর্তা। জিনিসপত্র কেনার কি হচ্ছে? মেয়ের বিয়ে এমনি এমনি হয়? তুমি ত কিছু করনি। আমি সব লিস্ট করে ফেলেছি।"

"তাই ত। আমার খুব ভুল হয়ে গেছে," রণেন বলেছিল।

"কনেকর্তা, মুখের কথা নয়। ফেল টাকা। ফাঁকির উপর আমি কিছু হতে দেব না।"

রণেনও অনেক টাকা দিয়েছিল, আর কৃষ্ণও। অমৃতার এক পয়সাও খরচ করতে দেয় নি।

খরচ করার ছিলই বা এমন কি। সারদা দেবীর যৎসামান্য ইনকামের উপরই ত অমৃতা এতটা এগিয়ে এসেছে।

সেলাইতে ওস্তাদ বাণী সেদিকটা অনেকটা নিজেই সামলেছিল। তা ছাড়া অমৃতার বন্ধু ও বান্ধবীরাও হাত লাগিয়েছিল।

অমৃতার চোখের সামনে সেদিনটার কথা এমনভাবে ভেসে উঠেছিল, মনে হচ্ছে এই ত সেদিনের কথা। বাণীই দিয়েছিল কনের সাজে সাজিয়ে। সবাই চেয়েছিল মুগ্ধ চোখে।

কৃষ্ণ যেন চোখ ফেরাতে পারছিল না।

অমৃতার মুখ হয়ে উঠেছিল লজ্জায় রাঙা। আশ্রমে, বলতে গেলে, সংসারের বাইরে মানুষ অমৃতার কাছে সে এক নতুন অনুভূতি।

রেজিস্ট্রারী অফিসে যাবার আগে দু'জনে গিয়েছিল মহারাজের আশীর্বাদ নিতে। সেদিন সবাই দেখেছিল, মহারাজের চোখে জল।

সুখের জল, শান্তির জল। দু'জনের মাথায় হাত রেখে মনে মনে আশীর্বাদ করেছিলেন।

বিয়ের পরে অমৃতার কথামত আশ্রমেই তারা ফিরে গিয়েছিল। স্বামীজীদের সঙ্গেই খেয়েছিল ও অনেকটা সময় কাটিয়েছিল। রাত্রে ফিরে দেখল রণেন ও বাণী ওর ফ্ল্যাটটা নিখুঁতভাবে সাজিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

বিরাট পার্টি দিয়েছিল ডঃ রাও। সবই হয়েছিল নিখুঁতভাবে। বিয়ের কয়েকদিন পরে দু'জনে বাণীর হাতে বাড়ির চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

দু'জনে অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছিল অন্ধ্র প্রদেশটাই দেখে আসবে। ছুটিটা ওখানেই কাটিয়ে আসবে। সবাই বলেছিল,—আরও কত দেখবার জায়গা আছে। সব ছেড়ে-ছুড়ে শেষে অন্ধ্রতে?

"বা রে? এখন কি বাইরে তাকাবার সময়? নিজেদের নিয়ে নিজেদের থাকবার সময়। তাই বেছে বেছে চলেছে ওখানে।"

"বাণী নিজেদের কথা ভেবেই বলেছে।" কৃষ্ণ বলেছিল।

"আহা, ভাজা মাছটা উলটে খেতে জানে না। পেটে পেটে কতদূর এগিয়েছিল। আর আমরা হাঁদারাম ভেবে মরি, আহা কৃষ্ণের কি হোল।"

"আমার বোনটি কিন্তু একদম সাদাসিধে।"

"দেখ দেখ, ওর চোখে কেমন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। আগের মতো কিন্তু ও সেই 'প্রেমের সাগরে সিনান করিয়া', বুঝতে পেরেছ মশাই?"

"যাঃ বাণীদি যে কি বলে।"

"বাণী ঠিকই বলেছে। তুমিই ত বলেছ—চল এমন জায়গাতে যেখানে বেশী কিছু দেখবার থাকবে না। দু'জনে শুধু গল্প করব আর থাকব গিয়ে।" কৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেছিল।

"ঠিক আছে। আর যদি কোনো কথা বলি।"

"এটা কি করলে? হাটের মধ্যে হাঁড়ি ফাটালে।"

ওদের অ-রিসেপশন জানাতে ইউনিভারসিটির প্রায় সকলেই

গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। হায়দ্রাবাদে পৌঁছে একটা দিন ত ওরা বলতে গেলে হোটেলেই কাটিয়ে দিল।

"জান কৃষ্ণ, মাদ্রাজের বাইরে এই প্রথম আমার আসা। এই বয়স পর্যন্ত আমার কিছুই দেখা হয় নি। নিজের কথা ভাবলে কেমন যেন অবাক লাগে। ছোট থেকে একভাবে মানুষ হয়েছিলাম। এ যেন অন্য জগৎ। প্রথম সত্যিই ভয় হয়েছিল, দ্বিধা হয়েছিল। পারব কি চলতে সবার সঙ্গে ?"

কাছে টেনে নিয়ে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিল, "এখন কি মনে হয় ?"

"এখন মনে হয় এর মধ্যেই ছিলাম। তোমার পাশে, তোমার কাছে।"

কপাল থেকে টুকরো টুকরো চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে কৃষ্ণ বলেছিল, "তাই হয়।"

"মহারাজ আমাকে সাহস দিয়েছিলেন—কৃষ্ণকে আমি চিনেছি! সব দিকে ও তোমার উপযুক্ত। তুমি শান্তি পাবে ওর কাছে। ওরও যে তোমাকে দরকার।"

এই রকম টুকরো টুকরো কথার শেষ ছিল না। পরের দিন ওরা বেরিয়েছিল দেশটা দেখতে।

"জান, হায়দ্রাবাদ ভারতবর্ষের পাঁচটা বড় শহরের মধ্যে পড়ে।"

অমৃতা শুনতে ভালোবাসে। এখন ত বিশেষ করে কৃষ্ণের কথা ওর কাছে অমৃত সমান।

কৃষ্ণ বলতে ভালোবাসে। আর এমন শ্রোতা।

"ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক শহরের চাইতে এটা কম পুরানো। মুসলমান সুলতানরাই এটা বানায়। তাই দেখছ ত, পারসিয়ান গন্ধ সব কিছুতে ছড়িয়ে আছে।"

"সত্যিই তাই। মাদ্রাজে যেমন হিন্দু প্রভাব, তা এখানে নেই।"

ওরা দু'জনে গিয়ে দাঁড়াল 'চারমিনারে'র নিচে হাত ধরাধরি করে। কৃষ্ণের হাত ধরে থাকতে অমৃতার বড় ভালো লাগে।

"এত জোরে ধরেছ কেন?"

'যদি পালিয়ে যাও," হেসে বলেছিল অমৃতা।

"আচ্ছা পাগলী মেয়ে।"

এখন মনে হয়, ভগবান এত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেবেন বলেই কি প্রথম থেকেই যেন হারাই হারাই ভাবটা তার মনে হোত।

"একে অনেক সময় বলা হয় পূর্বের 'আর্ক অব ট্রাইয়াম্ফ'।"

ওখান থেকে ওরা গেল মক্কা মসজিদ দেখতে।

"কি বিরাট দেখেছ? এতবড় মসজিদ ভারতবর্ষে কোথাও আছে কি না জানি না। এখানে দশ হাজার লোক একসঙ্গে প্রার্থনা করতে পারে।"

"সত্যিই, কি বিরাট।"

"তুমি ছাই দেখছ। তুমি ত দেখছি আমাকে দেখছ। আমাকে বেশী দেখো না। সারা জীবন ত দেখতে হবে। তখন বুঝবে ঠেলা।" কৃষ্ণ রাও হেসে উঠল।

যে অমৃতার হাসিতে শব্দ ছিল না, মুখের উপব এসে মিলিয়ে যেত, সেই মেয়ে একটু জোরেই যেন হেসে উঠল।

চমকে কৃষ্ণ তার দিকে তাকাল, "বারে, আমার চোখ দিয়ে যা দেখতে ভালো লাগে তাই দেখব। সেখানে বাদ সাধবার তুমি কে? এখানেও মাস্টারি ফলাবে সেটি হচ্ছে না।"

অমৃতা ওর হাতটা ভালো করে জড়িয়ে ধরল। কৃষ্ণর বড় ভালো লাগল এই হাসিটা আর এই উচ্ছ্বাস।

"তুমি কিন্তু অনেক বদলে গেছ।"

"বদলেছি ত। এখন আমার ভালো লাগে হাসতে, কথা বলতে। মনে হয় এই পৃথিবীতে আমার জানার বাইরে অনেক কিছু আছে। এই সুন্দর পৃথিবী নূতন রূপে, নূতন সাজে ধরা দিয়েছে। আমার এখন সবকিছু ভালো লাগে। শুধু তোমাকে পেয়েছি বলে।"

কৃষ্ণ রাও অমৃতার কোমরটা জড়িয়ে হাঁটতে লাগল, আর মনে

হোল যেন প্রার্থনা করছে—হে ঈশ্বর, অমৃতার মুখের হাসি তুমি অক্ষুণ্ণ রাখ।

"কি হোল ? লেকচারে বাধা পেয়ে চুপ মেরে গেলে ? প্রফেসর মশাই, শুরু কর তোমার কথা। কান দুটো এই খাড়া করে রাখলাম।"

কৃষ্ণর মনটা এত ভরেছিল, সে যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

"ঠিক, ঠিক। কি যেন বলছিলাম ? একটু খেই ধরিয়ে দাও না লক্ষ্মীটি।"

"বিরাট পণ্ডিতের মুখে এই কথা! ধরণী, দ্বিধা হও।"

ধরণী মোটেই দ্বিধা বোধ করবে না। তার যে মনে আছে সেই মুহূর্তটার কথা— 'তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।'

"আমরা কিন্তু কথা বলতে বলতে এসে গেছি সালারজং মিউজিয়ামের কাছে। ঢুকবে নাকি ?"

"নিশ্চয়ই। এর ভিতরে অনেক কিছু দেখবার আছে।"

এখানে অনেক পুরানো নথিপত্র আছে, আর আছে বহু বছর আগেব পোশাক-আশাক। তাছাড়া আছে আগের দিনের অস্ত্রশস্ত্র।

এভাবে ধীরে ধীরে দু'জনে হায়দ্রাবাদের অনেক কিছুই দেখল। একদিন সকালে ওরা চলে গেল গোলকুণ্ডা দুর্গ দেখতে এবং কুতুবশাহী রাজাদের কবর দেখতে।

"শোন, তোমাকে মিতা বলে ডাকব। তোমার অমৃতা নামের তুলনা নেই, কিন্তু ঐ নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন এক অপার্থিব রেশ যে, তোমাকে কাছে টানতে ভয় হয়। সমান ভাবতে বাধে। তাই অনেক ভেবে এই নামটা ঠিক করেছি। যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

"খুব ভালো হবে। আমি শুধু তোমার মিতা, আর সবার কাছে অমৃতা। জান কৃষ্ণ, যদিও অমৃতা আমার নাম, সে নামেই আমি পরিচিতা, তবু তোমার মতো আমার মাও একটা নাম রেখেছিল। আদর করে একলা ঘরে ডাকত 'অমি'। যখনই মনে হয় এই কথা,

বুঝি মা সকলের থেকে আলাদা করে, শুধু নিজের করে নিয়েছিলেন এই ছোট ডাকটার মধ্যে দিয়ে।”

কৃষ্ণ রাও ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল, জলে টলটল করছে। একটুক্ষণ চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

এই অন্তরের অনুভূতি যেমন দুঃখ দেয়, তেমনি দেয় শান্তি।

“তোমার মার তুমি ছিলে ‘অমি’। আমার হলে ‘মিতা’। এ ডাক রইল তোমার আর আমার মাঝখানে। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না। আর সবার কাছে তুমি অমৃতা।”

“বেশ তবে তাই হোক।”

ডঃ রাও ফিরলো তার স্বভাবসিদ্ধ চিন্তাধারায়।

“এই দুর্গ অনেকভাবে আক্রমণ হয়েছে; কিন্তু কেউ নিতে পারে নি। আওরংজেব দশ বৎসর এটা ঘেরাও করে বসে থেকে তবে জয় করতে পেরেছিলেন। এই গোলকুণ্ডার হীরকখনি থেকেই পৃথিবী বিখ্যাত কয়েকটা হীরে বের হয়। কেথারিন দি গ্রেট কিনেছিলেন অর্লফ ডায়মণ্ড (Orloff Diamond)। বৃটিশ রাজার মুকুটের কোহিনূরও এখানকার। আরো আছে ইরানের শার ময়ূর সিংহাসনে।”

“সত্যি, এইসব চোখ ঝলসান হীরেগুলো ঠিক কোনদিন না কোনদিন তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখব। কি বল?”

ডঃ রাওর কানে সে কথা গেল কিনা বোঝা গেল না। সে তখনও তার নিজের ভাবে বিভোর।

“একটা অদ্ভুত কাহিনী শুনেছি আর একটা হীরের বিষয়ে।”

“কি কথা?”

“শুনেছি ঐ হীরে যার কাছে যায়, তার হয় সর্বনাশ। নামটি কিন্তু হোপ ডায়মণ্ড।”

“উল্টো বুঝলি রাম যাকে বলে। তাই না? যার নাম আশা, সেই করে নিরাশ।”

॥ বার ॥

"রিণরিণটা এলো না কি? এত তাড়াতাড়ি ত আজ ওর আসার কথা নয়," নিজের মনে মনেই বলে অমৃতা।

উঠে গিয়ে দেখল। না, কেউ না। দূরের আওয়াজ কাছের মনে হয়েছিল।

আজকে বড় ভালো লাগছে আগের কথা ভাবতে, আগের দিনে ফিরে যেতে, আগের মধ্যে চলে যেতে। বাস্তবে ত তা হবার নয়। তবুও ভাবনার মধ্যে পেলেও তা কম নয়।

এতটা সময় একা থাকার সুবিধা অমৃতা দেবীর বড় একটা হয় না। আগে ইচ্ছে করেই নিজেকে ব্যস্ত রাখত। না হলে তার পক্ষে এতটা পথ এগিয়ে আসা শক্ত হোত। এখন অনেকটাই শান্ত হয়ে গেছে।

তাই এই একাকিত্ব তাকে পূর্ণতা এনে দেয়।

অনুভব করে, কোনো কিছুই হারিয়ে যায় নি। সবই রয়েছে। সবাই রয়েছে। মা সারদা দেবী, মহারাজ, কৃষ্ণ।

তার মনে হয়, তারা বেঁচে থাকতে কেমন যেন একটা হারাই হারাই ভাব সব সময় তাকে কষ্ট দিত। এখন আর সে ভয় নেই। চোখের সামনে নেই বলেই ত আজ তারা চোখের মণির মধ্যে স্থান নিয়েছে। অন্তরস্থলে সকলে রয়েছে।

কোনোদিনই আর তাদের সরিয়ে নিতে পারবে না। এই যে পরম শান্তি সেই অনুভূতিটা আসার পর থেকেই তার মন শান্ত স্থির হয়ে গেছে।

বাইরে থেকে বড় একটা কেউ বুঝতে পারত না।

সবাই ভাবত অমৃতা কত ধীরভাবে এত বড় দুঃখটা নিয়েছে।

কেউ কি দেখতে পেত বা বুঝতে পারত তার ভিতরে যে প্রবল ঝড় বইছে। মৃত ভলক্যানো জেগে উঠে হাড়মাংস সব দুম্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে শেষ করে দিচ্ছে।

তার গুরু, মহারাজের আশীর্বাদ না থাকলে সে আজকে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তা পারত না। আর দশটা মেয়ের মতো হয় ভেসে যেত, না হয় ছন্নছাড়া ছিটগ্রস্ত মেয়েতে পরিণত হোত।

কৃষ্ণ মারা যাবার পর যখন দুঃখে অস্থির হয়ে পড়েছে, অনুভব করেছে মায়ের দুটি হাত তাকে জড়িয়ে ধরেছে আর মহারাজের হাত তার মাথার উপরে।

কানে যেন শুনতে পেত—'এই বিশ্বে কোনো কিছুই হারিয়ে যায় না। তুমি যেমন আছ, আমরাও আছি, কৃষ্ণও আছে। তোমার কাজ শেষ হলেই আমরা মিলিত হব।'

বারান্দায় ফিরে এসে চেয়ারে বসে আবার আগের চিন্তায় ডুবে গেল অমৃতা।

"চল মিতা, আমরা কাজিপেটে যাই।"

"সে ত অনেক দূর কৃষ্ণ।"

"আমার ত মনেই ছিল না দুটো সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে।"

"ভালো হবে না বলছি। তুমি কি আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ? ও ত মাত্র নব্বই মাইল দূরে।"

"তাই বুঝি?"

"আবার দুষ্টুমি হচ্ছে। তুমি ত ভালো করেই জান।"

"তবে কালই চল ওখানে। অনেক কিছু দেখাব তোমাকে।"

"তুমিও ত দেখবে। তুমিও ত দেখনি।"

"ঠিক। জান মিতা, নিজের দেখার আনন্দের চাইতেও তোমাকে দেখানোর আনন্দটা যে কত বেশী।"

অমৃতার এখনও মনে পড়ে, আনন্দে তার চোখ জলে ভরে

এসেছিল। তাকে এত ভালোবাসার লোকও ছিল পৃথিবীতে। পরের দিন সকালে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দু'জনে বাসে করে বেরিয়ে পড়েছিল কাজিপেটের উদ্দেশে। কৃষ্ণর দেখাবার উৎসাহ, অমৃতার কৃষ্ণর কাছে থাকার আনন্দ।

ওরা ওখানে কয়েকটি দ্রাবিড় মন্দির দেখল। এদের বিশেষত্ব হচ্ছে পিরামিডের মতো চূড়া। হেলামকোন্ডার মন্দিরে গিয়ে কৃষ্ণ বলেছিল, "এটা বানিয়েছিল চালুক্য রাজারা। এর বিশেষত্ব হচ্ছে এক হাজারটি স্তম্ভ আছে এই মন্দিরটিতে।"

"সত্যিই ত। আর দেখ কি সুন্দর কারুকার্য। যাই বল, সবচাইতে সুন্দর কিন্তু কালো পাথরের নন্দীর মূর্তিটা।"

"ঠিকই বলেছ। আর সব মূর্তিকে ছাপিয়ে গেছে।"

ওখানে ওরা দু'দিন থেকেছিল।

অমৃতার আর ঘুরতে ভালো লাগছিল না।

"আমার একটু বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করছে। আমি এখানে হোটেলে থাকি। তুমি যাও, ওয়ারঙ্গল দেখে এসো।"

"তা কি হয়? আমি ত তোমাকে বলেছি মিতা, তোমাকে ছেড়ে একদিনও আর আমি থাকতে পারব না। তার চাইতে এসো, তোমাকে ওখানকার কথা আমি এমন করে বলব যে, তুমি বলবে···

"আমি, আমি বলছি—আমি কি বলব—তুমি কি ম্যাজিক জান, বন্ধু! নিয়ে না গিয়েও চোখের সামনে সব এনে দেখিয়ে দিলে।"

ওদের দু'জনকে দেখে সকলের চোখ যেত জুড়িয়ে। চেনা-অচেনা। ওদের দু'জনের প্রতি ভালোবাসা যেন ওদের চোখের দৃষ্টি থেকে প্রতিফলিত হোত। মনে হোত এ যেন সত্যিকারের কৃষ্ণ-রাধা।

কৃষ্ণ রাও ছিল শ্যাম ও অমৃতা ছিল ফরসা।

জড়িয়ে ধরে কৃষ্ণ বলেছিল, "কি এক বন্ধনে যে তুমি আমাকে বাঁধলে? এর থেকে উদ্ধার যে আমার কোনোদিন হবে না। এ জন্ম ত বাদই দিলাম, জন্মজন্মান্তরেও নয়।"

চোখ পাকিয়ে অমৃতা বলেছিল, "সে কি, কৃষ্ণ। এখনই মনটা উড়ু উড়ু করছে নাকি? সে গুড়ে বালি। আমার এই লম্বা বেণী দিয়ে ও আঁচল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখব। আর তোমার চোখ দুটি আমার চোখ দিয়ে।"

"করব কেন বলছ। তাই ত করেছ। তুমি কিন্তু জান না, এই বাঁধনে যে আমি চিরদিন থাকতে চাই। এ যে বন্ধনহীন গ্রন্থি। তাকে ছাড়াবার সাধ্য কারও নেই।"

হঠাৎ অমৃতার চোখ পড়ল আকাশের তারাগুলোর দিকে। মনে পড়ে গেল মায়ের কথা।

সে ছোটবেলায় ভাবত, মা তাকে কোনোদিন ছেড়ে যেতে পারবে না। কিন্তু আজ?

তার চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কৃষ্ণ একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। ওকে এত ভালোবাসে বলেই বোধহয় ওর মনের কথা সব বুঝতে পারে!

"মার কথা ভাবছ?"

অবাক হয়ে অমৃতা জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি করে বুঝলে?"

"তোমার মন আর আমার মন যে একসূত্রে বাঁধা। সেতারের একটা তারে ঘা দিলে অন্য তারগুলোও একটা মৃদু ঝংকার তোলে।"

"তা বটে।"

"সেই রকম তোমার মনে যে ভাবনার ছাপ পড়ে, তার রেশ এসে আমার প্রাণে বাজে।"

"মার কথাই ভাবছিলাম, বন্ধু। ধারণা ছিল মা কোনোদিন আমাকে ছেড়ে যাবে না। ছোটবেলায় অবশ্য। আজ আমি কোথায় আর মা-ই বা কোথায়!"

"শোন মিতা, তোমার মা ত কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে যান নি, ছেড়ে যাবেন না। তাই তোমার অনুভূতির মধ্যে উনি আছেন ওতপ্রোতভাবে। আমি ত তোমার চোখের সামনে অনেকদিন আছি।

কিন্তু যতক্ষণ মনের মধ্যে না প্রবেশ করেছি ততক্ষণ কোথায় ছিল আমার অস্তিত্ব ? তাই ত বলি ভালোবাসার জন পাশে থাকে, সাথেই থাকে। তা চোখের সামনেই হোক বা অন্তরালেই হোক।”

কৃষ্ণর কথা শুনতে শুনতে বড় শান্তি পায় অমৃতা। স্নিগ্ধতায় ভরে যায় ওর মন।

ওর কাঁধের ওপর মাথাটা রেখে ওর কাছ ঘেঁষে শুয়ে পড়ল অমৃতা। কৃষ্ণ ওকে কাছে টেনে নিলো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

“অনেক রাত হোল, মিতা। ঘুমিয়ে পড়।”

“কালকে ত মনসা ওয়ারঙ্গল গচ্ছামি।”

সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে দু’জনে গিয়ে বসল হোটেলের সামনের সুন্দর বাগানটিতে।

“এখন তোমার চোখের সামনে তুলে ধরবো ওয়ারঙ্গল শহরের ইতিকথা। বহু বহু বৎসর আগে কাকতীয় নামে এক অন্ধ্র রাজবংশ এই নগরের পত্তন করেছিলেন। তাঁদের রাজধানী ছিল এটা।”

“এসব শুনলে মনে হয় ফিরে যাই সেই সময়ে যখন আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যেই আমরা ছিলাম। এই জগাখিচুড়ি হয়ে যেমন আছি এখন, তার চাইতে কি ভালো ছিল না ?”

“বোধহয় ছিল, বোধহয় ছিল না। তবে এটা ত ঠিক, যখনই যে জিনিস এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে পড়ে তখনই হয় তার মৃত্যু। আমরা সবাই চলমান—দেহে, মনে, চিন্তায়। তাই পরিবর্তন হবেই। তাছাড়া দেওয়া-নেওয়ার মধ্যেই ত পূর্ণতা আসে। জান, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—‘দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে।”

“সত্যি কথাই বলেছ। বল, আমি শুনব।”

“জান, মার্কোপোলো এই শহরে এসে এর ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি আরও লিখেছেন—এখানকার কাপড় এত সুন্দর যে তা যে-কোনো দেশের রাজা-রাণীর কাছে আদরের।

ওখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক দুর্গম জায়গাতে শোনা যায় এ দেশের সবচাইতে সুন্দর মন্দির আছে। নাম রামাপা।"

"এমন জায়গাতে কেন করেছিল? মানুষ যদি নাই যেতে পারে?"

"তখন ত আর তা ছিল না। জনবহুল নগর ছিল। হতে পারে, তখন আমরা দু'জনে একসঙ্গে কতবার ওখানে প্রণাম করতে গেছি।"

এর পরে তাদের মুখের ভাষা যেন ফুরিয়ে এসেছিল। দু'জনে দু'জনের হাত ধরে কতক্ষণ বসেছিল ঠিক নেই। চমক ভাঙল হোটেলের বেয়ারার ডাকে—"দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে।"

এইভাবে ওদের ছুটির দিনগুলো গেল ফুরিয়ে। মাদ্রাজে ফিরে আসার আগে ওরা তিরুপতির মন্দির দেখেছিল। আবার এদিকটাতে কবে আসা হবে ঠিক নেই।

ডঃ রাও বরাবরই দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। এখন মিতার মতো সঙ্গী পেয়ে ঠিক করে ফেললেন, প্রতি বৎসরই কোথাও না কোথাও যাবেন।

আর অমৃতার কাছে এ এক অনাস্বাদিত আনন্দের উৎস। তার ছোট্ট জীবনে সে কখনো সুযোগ পায় নি মাদ্রাজের বাইরে পা বাড়াতে। মনে ইচ্ছাও হয় নি। এখন তাই সে ভাবে, কি করে এই আকাঙ্ক্ষা তার মনের কোণে ছিল লুকিয়ে।

শান্তি ও সুখের মধ্য দিয়ে দিনগুলো দ্রুত চলতে লাগল। অমৃতা ভালোভাবে এম-এ পাশ করল। কৃষ্ণ রাও মহারাজের কাছে দীক্ষা নিল। ছুটির দিনে প্রায়ই দু'জনে গিয়ে মহারাজের পায়ের কাছে বসে কত কথা শোনে।

তিনি ত শুধু গুরু নন। তিনি যে আপনজন।

একদিন মহারাজ বললেন, "আমি সারাজীবন এক একটা ইনস্টিটিউট চালিয়েছি। এখন মনটা চাইছে ছুটি। যে ক'টা দিন বাঁচব, ফিরে যেতে চাই প্রকৃতির কোলে। পড়াশুনা করতে চাই।

চিন্তার মধ্যে কাটাতে চাই। তাই বেলুড় মঠে জানিয়েছিলাম। হরিদ্বারের আশ্রমে গিয়ে নির্জনে কাটাতে চাই। অনুমতি পেয়েছি।”

“মহারাজ, আপনি চলে যাবেন?” অমৃতার গলায় কান্নার সুর ভেসে উঠল।

“আচ্ছা পাগলী ত। এখন ত দোসর পেয়ে গেছ। তাছাড়া আমি ত হরিদ্বারে থাকব। যখন ইচ্ছে করবে চলে এসো। আমার কাছে ক'দিন আশ্রমে কাটিয়ে যাবে।”

মহারাজ অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। অমৃতা মহারাজের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে সাহস পেল না। মনের ভেতরটা তোলপাড় হতে লাগল।

তাড়াতাড়ি প্রণাম করে কৃষ্ণর হাত ধরে উঠে পড়ল।

“কৃষ্ণ, আমার কি হবে? এই কি আমার কপালের লিখন? দু'জন ভালোবাসার জনকে আমি কিছুদিনের জন্য একসঙ্গে কাছে পেতে পারি না?”

“কেন তুমি এত অধীর হচ্ছ মিতা? প্রতি বছর আমরা মহারাজের কাছে যাব।”

“তুমি বুঝতে পার নি কৃষ্ণ, আমি আজ ওঁনার দিকে তাকিয়ে বুঝেছি—উনি আর বেশী দিন এই পৃথিবীতে থাকবেন না,” এই বলে অমৃতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

“তুমি না মহারাজের স্নেহে বড় হয়েছ? তুমি না সারদা দেবীর মেয়ে? এরকম অস্থিরতা কি তোমার সাজে?”

অনেকক্ষণ অমৃতা চোখ বুজে বসে রইল। যেন মনে মনে প্রার্থনা করল শক্তির জন্য।

“আমি এখন একটু নিচে যাই কৃষ্ণ। বাণীদের কাছে।”

কৃষ্ণ শুধু মাথা নাড়ল। তারও মনটা অস্থির অস্থির লাগছিল।

মহারাজ যে শুধু গুরু ছিলেন, তা নয়, বড় ভরসা ছিলেন। মনের সব কথা গিয়ে তাঁর কাছে খুলে বলতেন। কোনো সংশয়ের মীমাংসা

তিনি দিতেন করে। ছোট থেকেই আশ্রয়হীনভাবেই বলতে গেলে বড় হয়ে উঠেছেন। ওঁনার কাছেই যেন পেয়েছিলেন আশ্রয়।

তখনই মনে হোল, এই বয়সেও মানুষ চায় আশ্রয়। মানে, নির্ভর করতে। ভালোই হোল ও বাণীর কাছে গেল।

নিজেই এত চঞ্চল বোধ করছে, ওকে কি সান্ত্বনা দেবে।

একদিন দু'জনে গিয়ে মহারাজকে প্লেনে তুলে দিল। মহারাজ কিছুদিন কলকাতায় বেলুড়ে বিশ্রাম করে চলে যাবেন হরিদ্বারে। দু'জনের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, আশ্বাস দিলেন চিঠি লিখবেন।

অমৃতা কোনো কথাই বলতে পারল না। কথা বলতে গেলে যদি এত লোকের মাঝখানে কেঁদে ফেলে।

কৃষ্ণ শুধু বলল, "আমরা শীগ্‌গির আপনার কাছে যাব।"

প্লেন ছেড়ে দিল।

॥ তের ॥

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে অমৃতার।

কৃষ্ণ তখনও ঘুমাচ্ছে। একবার ইচ্ছা হোল ওকে তোলে। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া হোল। সারাদিনের খাটুনির পর ঘুমায়।

প্রফেসারের জীবনটা বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বেশ সহজ, ঢিলে-ঢালা জীবন। তা সত্যি কিন্তু নয়, যদি সিরিয়াসলি কেউ নেয়। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর দিকে চোখ রাখা, মানে সত্যিকারের তাদের বোঝা বা জানা। যেমনটা কৃষ্ণ রাও করে।

সবার অজান্তে সবার উপর নজর রাখতে হবে। তাদের একজন হয়ে তাদের দোষ-ত্রুটি দুর্বলতা এমনভাবে ধরিয়ে দিতে হবে যে, তারা

বুঝবে না তাদের বোঝানো হচ্ছে। বাচ্চাদের সঙ্গে চলা যত সহজ, বড় অথচ সত্যিকারের বুদ্ধিতে নয় তেমন কলেজের বা ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে চলা তত সহজ নয়।

অমৃতা ভাবে সত্যি কৃষ্ণ শুধু যে বিদ্যায় পণ্ডিত তা নয়, মানুষ হিসেবে সত্যিকারের একজন মানুষ। ভগবানের তার প্রতি দয়া, তাই ত ডঃ রাওকে সে পেয়েছে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সূর্য ওঠার আগের মুহূর্তের আবির ছিটান আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কথা তার মনে আসছিল। তার জন্ম মুহূর্ত রয়ে গেল চিরকালের জন্য অজানা। মনে হয়, এ যেন এক রূপকথার কাহিনী। অলক্ষ্যে থেকে একজন একটির পর একটি ঘটনা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিল। মহারাজ, মা সারদা, তারপর এল কৃষ্ণ।

হঠাৎ কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে ফিরে দেখল কৃষ্ণ তার পাশে। সেও আকাশের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"চল, আজ ছুটি। সমুদ্রের ধারে গিয়ে একটু বসি।"

"বেশ।"

দু'জনে ভরদ্বাজকে বলে বেরিয়ে পড়ল।

"কৃষ্ণ একটা বুদ্ধি দাও। এম-এ পাশ করার পর বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। কিছুই করি না।"

"কেন? প্রায়ই ত দেখি লাইব্রেরিতে পড়াশুনা কর।"

"তা ঠিক। প্রথম ভেবেছিলাম পড়ব, শুধু পড়ব। মহারাজ চলে যাবার পর—আশ্রমের যে কাজ নিয়মমত করে যেতাম, তা গেল থেমে। ওখানে যেতে তেমন মন চায় না।"

"তা কেন? তুমি ত প্রায়ই যাও।"

"প্রায়ই যাওয়া আর সেটাকেই আস্তানা মনে করা তফাৎ আছে না? যাক সে কথা। মহারাজ নেই, তাই মন তেমন টানে না। আসলে কি জান? মার পুরো মনটা আমি পাইনি।"

"তা ঠিক নয়। তুমি তাঁকে যখন দেখেছ, তখন তোমার বাবা গত হয়েছেন। তোমার অবস্থা একটু অন্য রকম ত।"

"ঠিকই বলেছ। তোমাকে পাবার পর আমি বেশ বদলে গেছি। এখন আমার মন চায় কিছু করি, অনেক কিছু করি। রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। একটা চাকরি করব নাকি?"

"কোন্ দুঃখে? তার চাইতে তুমি ডক্টরেটের জন্য পড়াশুনা করতে আরম্ভ কর।"

"গ্র্যাণ্ড হবে।"

একটু থেমে ও বলেছিল, "না, থাক। একটা বাড়িতে একটা ডক্টরই যথেষ্ট। না হয় নেকষ্ট জেনারেশন সেটা করবে।"

"বেশ ত। কি করবে ঠিক করেছ?"

"গান শিখব। রবি ঠাকুরের লেখা গান। শুধু তাই শিখব, শুধু তাই গাইব। তুমি ভালোবাস।"

"সেই ভালো।"

এই সব নানা কথার মধ্যে কৃষ্ণ যে কথাটা বলতে পারছিল না, কারও কাছে না বলে চেপে রেখেও অশান্তি পাচ্ছিল, তা বলে ফেলল।

"মিতা বুদ্ধি দাও। বড় ভাবনায় পড়ে গেছি। তোমাদের চাইতে বছর দুয়েকের জুনিয়ার ছিল কামাক্ষী। সে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

"কেন? তার কি কোনো অসুখ করেছে? আমি অবশ্য আজকাল তেমন আর খোঁজ রাখি না। ইউনিভার্সিটির ব্যাপার। সময়ও পাই না।"

"সে কি? এখনই ত বললে, অঢেল সময়, কি করে কাটাবে ভেবে পাচ্ছ না।"

"তাই বুঝি বলেছি? নিজের ছোট্ট মিষ্টি সংসার, ফাঁকে ফাঁকে বাণীদির সঙ্গে গল্প, তার কাছে রান্না শেখা, আর পড়াশুনা ত আছেই।"

"আমি একেবারেই বরবাদ ?"

"তা কেন ? সবার উপরে তুমি, সবার উপরে কৃষ্ণ।"

"থাক, থাক, খুব হয়েছে! শাক দিয়ে মাছ ঢাকা, ধরা পড়ে গেলেই কত কথা। এখন প্লিজ, একটু মন দিয়ে শোন ত।"

"আমি ত ভেবেছিলাম মক্ষীকে নিয়ে প্রবলেম। ওই ত এখন ওখানকার মক্ষীরাণী। চোখ ঝলসানো রূপ, তার উপর চারমিং গুরু-শিষ্য সবাই ত ঘিরে রয়েছে। তার চারপাশে সব মৌমাছি ভন্‌ভন্‌ করছে।"

কৃষ্ণ একটু হাসল, "ঠিকই বলেছ। মক্ষী বড় সুন্দর দেখতে। বুদ্ধিও আছে যথেষ্ট। ডাইনে-বাঁয়ে যা ঘটে তার কিছুই ওর চোখ এড়ায় না। সামনে যেমন কোমল, ভিতরে তেমনি কঠোর। মক্ষীরাণী হবার উপযুক্ত।"

"তুমি এত চিনলে কি করে ? মন পড়েছিল নাকি কখনো," হেসে অমৃতা বলল।

"মন না, চোখ পড়েছিল বলতে পার! বাইরেটা যেমন সুন্দর, ভেতরটা তেমনি সুন্দর মনে হয়েছিল। জান, কৃষ্ণ রাও চোখ খোলা লোক। তাই দু'দিন নজর রেখেই ধরে ফেললাম। সেই শক্তি আছে বলেই ত ঝোপের আড়াল থেকে রজনীগন্ধাটিকে ঠিক বেছে নিয়েছি।"

"যা ভাবছ, আমি ঠিক তা নাও হতে পারি, কৃষ্ণ। পরে পস্তাতে হতে পারে।"

"যা বলেছ। যা ভাবছি, তা না হতে পারে। রজনীগন্ধা ভেবে নিয়ে শেষে দেখব পারিজাত, স্বর্গের ফুল।"

"থাক, হয়েছে। বলতেও পার তুমি। কথাটাই ত বললে না। কামাক্ষীকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছ। কি ব্যাপার ? কিসের ভাবনা ?"

"বেশ কিছুদিন যাবৎই লক্ষ্য করছিলাম, ও বেণুগোপালের সঙ্গে ঘুরছে, বসছে, গল্প করছে।"

"কি হয়েছে তাতে ? মানুষ মানুষের সঙ্গে বেড়াবে না ? কথা বলবে না ?"

"তা ত বলবেই। কিন্তু চোখের ভাষা যে পড়তে জানে, তার কাছে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমি যে তা পড়তে পারি মিতা। তাই ত মানুষকে সহজে চিনি, বুঝি।"

"কোথায়, আমি যে তোমাকে ভালোবেসেছিলাম তা ত তুমি বুঝতে পার নি ?"

অমৃতা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ইচ্ছে করেই নিজের চোখ দুটোকে কৃষ্ণর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল।

কৃষ্ণ যেন একটু সময় নিল বলতে।

"আমি ঠিকই বুঝেছিলাম। তাই ত সাহস করে সোজাসুজি এগিয়ে যেতে পারিনি। মহারাজকে মাঝে দাঁড় করিয়েছিলাম। তোমার চোখই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তুমি আমাকে ভালোবাস ঠিকই, তবে এমন আত্মভোলা নয় যে তার বাইরে তুমি থাকতে পারবে না। এমনভাবে তুমি বড় হয়েছ যে, কোনো কিছুই তোমাকে অধীর করতে পারবে না।' কামাক্ষী ত সাধারণ মেয়ে। তাই ত এত চিন্তা।"

"এত ভাবছ কেন ? দু'জনে যদি ভালোবাসা হয় ? শেষ ভালো যদি হয় তবেই হোল।"

"সেখানেই ত বেধেছে গোল। বেণুর ভালোবাসাটা দু' দিনের। এই বয়সে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটে, আর তাছাড়া মক্ষীকে দেখে সে হয়েছে মুগ্ধ। হতে পারে সাময়িক। নাও হতে পারে। মক্ষী ত মক্ষীরাণী। যত আসে কোনো আপত্তি নেই। আর এদিকে বেচারা কামাক্ষী উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর পড়াশুনাতে মন নেই। দূর থেকে বেণুকে দেখে, আর ওর চোখ হয়ে উঠে সজল চঞ্চল।"

"তুমি এত খেয়াল করতে পার ?"

"পারি মিতা, পারি। যাদের আমি পড়াই, তাদের উপর যে আমার বড় স্নেহ। তাই আমার চোখকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। কামাক্ষীর মনের জোর কম। কিছু যদি অঘটন ঘটিয়ে ফেলে?"

"তা ত বেশ ভাবিয়ে তুললে তুমি। দাঁড়াও, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। বাণীদির সঙ্গে পরামর্শ করব। যেমন করে হোক, ওকে বোঝাতে হবে এই সংসারটা এত বিরাট যে, একবার ঠকাটা কিছুই আশ্চর্য নয়। তাছাড়া··"

"দাঁড়াও ত, মিতা। দেখ দূরে একটা মেয়ে সমুদ্রের ধারে জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে। কামাক্ষীর মতো না?"

"ঠিক ত। কামাক্ষী ত। এত ভোরে, একা সমুদ্রের এত কাছে। কি হবে?"

"আমরা হাত ধরে দৌড়াতে থাকি।"

বেশ কাছে যখন দু'জনে এসে গেছে, ওরা দেখল কামাক্ষী উঠে আস্তে আস্তে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হাতটা একটানে ছাড়িয়ে নিয়ে অমৃতা প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে পিছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরল। এত আচমকা যে, দু'জনেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

একটা বড় ঢেউ লাফিয়ে এসে ওদের উপর পড়বার আগেই কৃষ্ণ শক্ত করে মিতাকে জড়িয়ে ধরে ফেলল। এই আচমকা ঘটনাতে সবাই যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

সেই রাক্ষসের মতো ঢেউটাকে দেখে কৃষ্ণর মনে পড়ল অমৃতা সাঁতার জানে না। যদি ও নিজেকে সামলাতে না পারে, ঢেউয়ের টানেই···ও আর চিন্তা করতে পারে নি, লাফিয়ে মিতাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

মুহূর্তের জন্য পরিস্থিতির কথা ভুলে গিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিল কামাক্ষীর কথা। ওর জন্যই মিতা দৌড়ে গেছে।

"তুমি মিতা, এমনভাবে ছুটে জলে নামলে কেন? যদি কিছু হোত? ঐ এমন রাক্ষুসে ঢেউটা!"

অমৃতা বরাবরই শান্ত, ধীর। এখনো তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। ও বুঝেছিল, কত বড় বিপদ থেকে সকলে বেঁচেছে।

সে শান্তভাবেই বলল, "কি হোল হঠাৎ তোমার, কৃষ্ণ? তুমি ভুলে গেলে, কামাক্ষীকে চান করতে দেখে হঠাৎ আমারও জলে নামতে ইচ্ছে হোল। হঠাৎ কিছু করার মতো বোকামি নেই। সত্যি, কি কাণ্ড! সঙ্গে ত কাপড় আনিনি।"

কামাক্ষী যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। বেণুগোপালকে ও মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিল। ওর চিন্তা-ভাবনা, সব ছিল ওকে ঘিরে। মানে, নিজের অস্তিত্বটাই সে ফেলেছিল হারিয়ে।

তার বাবা মা আছে। তাদের উপর তার ভালোবাসা, কর্তব্য সবই যেন তার মন থেকে মুছে যাচ্ছিল। ছোট ভাই-বোন দুটাও কত সামান্য হয়ে গিয়েছিল। বেণুগোপালই হয়েছিল তার ধ্যান-জ্ঞান।

সেই বেণুগোপাল সরে গেছে মক্ষীর কাছ থেকে। তার মন এত অস্থির হয়ে পড়েছিল, তার পক্ষে বেঁচে থাকা হয়ে উঠেছিল বিড়ম্বনা। তাই সে এসেছিল ভোরে সমুদ্রের ধারে।

কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল। অমৃতাদি আচম্‌কা এসে তাকে পিছন থেকে ছড়িয়ে ধরাতে তখনই যেন সে কেমন হয়ে পড়েছিল। তারপর সামনে পাহাড়ের মতো ঢেউ গর্জন করে ছুটে আসছে। পরক্ষণেই ডঃ রাওর ব্যাকুল চিৎকার ও ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সরিয়ে নেওয়া।

বেশ কিছুদিন যাবৎ ওর মনের উপর দিয়ে খুবই স্ট্রেন্‌ যাচ্ছিল। তারপর অল্প সময়ের মধ্যে একটার পর একটা এতগুলো ঘটনা।

আর ও সহ্য করতে পারল না। অমৃতার গায়ের উপরই ও ঢলে পড়ল।

"এ কি? এ আবার কি হোল?" ডঃ রাও বলে উঠলেন।

অমৃতা ভালো আছে। ডঃ রাও এখন অনেকটা স্থির হয়ে গেছেন।

"কিছু না। মানসিক অশান্তির চোটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ওকে ধরে বালুর ওপর শুইয়ে দাও না।"

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কামাক্ষী চোখ মেলে তাকাল।

এক এক করে সব কথা তার মনে আসতেই লজ্জায় ও উঠে বসতে চেষ্টা করল।

"তুমি উঠতে চেষ্টা কোরো না। তোমাকে আর আমাকে, তুজনকে ভূতে পেয়েছিল। তাই ত সঙ্গে কাপড় না এনেই জলে নেমেছিলাম। যতসব ছেলেমানুষী।"

"ছেলেমানুষী আবার কি। তোমরা ত ছেলেমানুষই। যাক, তোদের পাল্লায় পড়ে আমিও একটা চুবোনি খেলাম। এখন যাই, একটা ট্যাক্সি ধরতে পারি কিনা।"

ডঃ রাও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রাস্তার দিকে রওনা হোল। ওরা তু'জনও আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল।

অমৃতা চোখ বুজে ভাবছে কত ঘটনাই না তার চারিধারে ঘটে গেছে। বিচিত্র পৃথিবী। বিচিত্র তার গতি। চোখ বোজা নির্লিপ্ত মুখের ঠোঁট তুটিতে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল। তার সঙ্গে তৃপ্তির। ওর মনে এলো কামাক্ষীর কথা। সেই মেয়েকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে সে ও বাণীদি হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। কতদিন যে এই শুধু ওরা করেছে।

মাথায় উঠেছিল ওর গান শেখার কল্পনা। তারপর সেই কামাক্ষীই কম্‌পিটিসনে অডিট সার্ভিসে ঢোকে। চাকরি পাওয়ার পরও ও অমৃতাদিকে ভোলে নি। এসেছে অনেকবারই দেখা করতে।

তারপর সবই গেল ওলট্-পালট্ হয়ে।

ছোট্ট রিণির হাত ধরে ও চলে এলো কলকাতায় কৃষ্ণকে

হারিয়ে। মাদ্রাজ জায়গাটাকে আর সে সহ্য করতে পারছিল না। তাই ত তার আসতে হোল জানা জায়গা ছেড়ে অজানা জায়গাতে।

যে কন্‌ভেণ্টে পড়েছিল। সেই স্কুলেরই মাদার তাকে জুটিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতার মিশনারী স্কুলের টিচারী। তা'ছাড়া বাণীদির স্বামীও কলকাতায় ভালো প্রফেসারী পেয়ে চলে আসার কথা ভাবছিলেন।

ওরাই ছিল ওখানে সত্যিকারের আশ্রয়। চাকরিও একটা জুটে গেল। ওদের সঙ্গেই এসেছিল প্রথম। একই ফ্ল্যাটে উঠেছিল।

"মিতা, কি ভাবছ?"

॥ চৌদ্দ ॥

হঠাৎ চোখ খুলে চম্‌কে তাকাল অমৃতা।

সেই ডাক, সেই গলা, কৃষ্ণ ত নেই। এ ডাক সে কি করে শুনল। এই স্বর শুনবার জন্য দিনের পর দিন সে প্রার্থনা করেছে।

সে অনুভব করল, সে পাশেই আছে। একই সঙ্গে তারা একই কথা ভাবছে। নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল অমৃতা।

সে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিল মিসেস ভেঙ্কটেশের কাছে। আশ্চর্য সুন্দর গাইতেন উনি। স্বামী ভালো কাজ করতেন। মিসেস কলকাতায় মানুষ। তাই ত এ বিদ্যে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে স্বামীও অনেকটা বুঝতে পারতেন।

রিটায়ারের বয়স হয়ে এসেছে। মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে দিল্লীতে। ছেলে ক্যানাডাতে।

মিসেস ভেঙ্কটেশ বড় ভালোবাসতেন অমৃতাকে। ছেলে-মেয়ে দূরে। মমতাটা গিয়ে পড়েছিল ওদের উপর।

অমৃতা ত যেতই। কৃষ্ণও প্রায়ই যেত। সেই সঙ্গে ওদের বন্ধু রণেন ও বাণী। বেশ ছিল সবাই মিলে যৌথ পরিবারের মতো।

অমৃতার গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত কৃষ্ণর খুব ভালো লাগত, বিশেষ করে একটা গান—

"নূপুর বেজে যায় রিণি রিণি
আমার মন কয় চিনি চিনি।"

মেয়ে হওয়ার পরে ডঃ রাওই নামকরণ করল রিণরিণ।

"জান, মেয়ে আমাদের জীবনে রিণরিণ করে শাস্তি, সুখ আনন্দের ঝংকার তুলবে। তাই এই নাম রাখলাম।"

অমৃতা ভাবে, সত্যিই মেয়ে আমার জীবনে শাস্তির আনন্দের ঝংকার তুলবে। এ বিশ্বাস ওর আছে যে রিণি ওকে শাস্তি দেবে।

কিন্তু কৃষ্ণ কি তার ভাগ পায়? মন বলে, পায়। সেটাই ত ভরসা। মহারাজ দেহ রাখার আগেই রিণরিণ জন্মেছিল; আর তাকে আশীর্বাদও উনি করে গেছেন।

সে দিনটার কথা মনে পড়ল। এক বছরের রিণিকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী চেপে বসল দিল্লীগামী ট্রেনে।

"মিতা, আমার কি যে ভালো লাগছে। মহারাজের আশীর্বাদ রিণিও পাবে।"

"সত্যিই, আমি অবশ্য আরও আগে পেয়েছিলাম। তবে রিণির মতো মা-বাবার সঙ্গে গিয়ে নয়। এক ধুলার মধ্যে পড়ে।"

স্বামী মুখ চেপে ধরেছিল, "থাক, সে কথা, মিতা। তবে একটা কথা ভুলে যেও না—তাই ত তুমি অমৃতা।"

সেবারে ওরা দিল্লীতে একদিন থেকেই চলে গিয়েছিল হরিদ্বারের আশ্রমে। ওরা মহারাজের কাছে কাছেই থাকত। এদিক-সেদিক বেড়াতে যেত না। দিন পনের সেখানে থেকে ওরা ফিরে এসেছিল মাদ্রাজে।

সেই শেষ যাওয়া।

তার কয়েক মাস পরেই খবর এসেছিল, মহারাজ দেহ রেখেছেন ঘুমের মধ্যে। একদিনের জন্যও ভুগে যান নি।

সেই দ্বিতীয় শোক অমৃতার জীবনে।

মার মৃত্যুর সময় যেমন মহারাজকে সম্বল করে ও উঠে দাঁড়িয়েছিল, মহারাজের যাওয়ার শোক কৃষ্ণকে পাশে পেয়ে ভুলেছিল। তাছাড়া ছিল ছোট্ট রিণি। চঞ্চল রিণি।

ওর জন্য গানও উঠেছিল মাথায়। কৃষ্ণ ঠাট্টা করে বলত, "কি ? অঢেল সময়, ডক্টরেট করব, চাকরি করব ? সব গেল কোথায় ?"

"কেন ?" রিণিকে জড়িয়ে ধরে বলত, "এই ত ডক্টরেট করছি। দেখ না, এমন শেখা শেখাব মেয়েকে তখন তুমিও ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।"

ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরেই কৃষ্ণ রিণির চার্জ নিত।

"এখন তুমি বিশ্রাম কর, গান কর, লক্ষ্মীটি। কোন একটা জিনিসে পুরো মন না দেওয়াই ভালো। বোঝ ত, বড় হলে দূরে যদি সরে যায়। নিজস্ব কিছু থাক তোমার। আমি ত ভেবেছি রিণি একটু বড় হলে তোমার আবার পড়াশুনার দিকে যেতে হবে।"

এইসব কথা ওদের প্রায়ই হোত। তখন কি জানত অমৃতা যে রিণি বড় হবার অনেক আগেই তাকে একক জীবনে পা বাড়াতে হবে।

রিণি হবার আগে একবার ওরা গিয়েছিল বাঙ্গালোরে। কি অপূর্ব জায়গা। মাইশোরের অর্থাৎ কর্ণাটকের রাজধানী।

দেশ দেখার আগেই ওরা পড়েছিল এক ঘটনার মধ্যে যার মীমাংসার জন্য যথেষ্ট সময় ও চিন্তা দিতে হয়েছিল অমৃতাকে।

একটা ছেলে ও মেয়ে এসে উঠেছিল ওদেরই হোটেলে। বাড়ি থেকে পালিয়ে।

মেয়েটি অবস্থাপন্ন বাড়ির, ছেলেটি তেমন উপযুক্ত নয়। মেয়ের বাড়ির লোকেরা বিয়ে দিতে নারাজ। স্পষ্টই সেটা তারা জানিয়ে দিয়েছিল। মেয়ের অন্য জায়গাতে বিয়ের চেষ্টা করছিল।

ছেলেটি বোধ হয় সেটা মেনে নিত, কিন্তু মেয়েটি মানবার পাত্রী নয়। মেয়েটিই বুদ্ধি দিয়ে, সাহস দিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে উঠেছে।

বাড়ির লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজি, থানা-পুলিশ করে সন্ধান বের করে। মেয়ের কাকাও সেইদিনই---মানে অমৃতা ও কৃষ্ণ যেদিন এসেছিল, এসে হোটেলে উঠেছে। মেয়ে ও ছেলেটাকে জানতে দেয় নি। আবার যদি পালিয়ে যায়।

অমৃতাকে দেখে কেমন যেন ভালো লেগে গিয়েছিল কাকার। তার মনে হয়েছিল, অমৃতার কথাতেই কাজ হবে। ম্যানেজারকে সব কথা খুলে বলতে, তারও মনে হয়েছিল এ-রকম ভাবে জীবনের শুরু হলে সমাজ তো তাদের গ্রহণ করবে না। পরিণতি ত বড় দুঃখের হতে পারে।

ডঃ কৃষ্ণ রাওকে এসে ওরা সব বলে ও অমৃতার সাহায্য চায়। মেয়ে বড় একগুঁয়ে। এখন সবাই রাজী আছে বিয়ে দিতে। তবে ছেলেটাকে শ্বশুরের ব্যবসাতে যোগ দিতে হবে।

সব শুনে অমৃতা ব্যাকুল হয়ে বলে উঠেছিল, "আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমার মেয়েটিকে বোঝাতেই হবে। এ আমি করবই। আপনি যান। পরে আপনাকে সব জানাব।"

অমৃতা অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিল যখন মেয়েটির কাকা ডঃ রাওকে বলছিল "আপনার স্ত্রী স্বয়ং দেবী না হলে পরের দুঃখে এত অশান্তি পেতে পারেন না। তাঁর আশ্বাসে আমি শান্তি পেয়েছি। ভগবান ওঁর সহায় হোন।"

ডঃ রাও বুঝেছিলেন, কেন অমৃতা এত অস্থিরতা বোধ করছে। নিজের অতীতের কথা, যা মিতার মন থেকে সরিয়ে রাখতে কৃষ্ণ চেষ্টা করে, তাই তাকে করে তুলেছে চঞ্চল।

ব্যথায় মিতার জন্য মন ভরে উঠেছিল। কেন এমন হোল? এসেছিল আনন্দে দু'দিনের ছুটি কাটাতে। সেখানেও রেহাই নেই।

ইচ্ছে হচ্ছিল তার মিতাকে ঢেকে রাখে সে সব রকম আঘাত থেকে। সংসারে কত দুঃখ, সমাজে কত অবিচার।

মিতাকে বলতে ইচ্ছা করছিল, "তোমার ঐ দুটি ছোট হাত দিয়ে কত সবাইকে আগলাবে?" কিছুই করল না বা বলল না ডঃ রাও।

সে জানে মিতাকে তার সঙ্কল্প থেকে ফেরান যাবে না। আস্তে করে সে শুধু তার হাতের উপর হাত রেখেছিল।

মিতা ফিরে ওর দিকে তাকাল, "মেয়েটাকে বোঝাতেই হবে, কৃষ্ণ। আমি জানি, আমি আমার প্রাণ দিয়ে বুঝি, কত দুঃখে, কত অপারগ হয়ে মা তার রক্ত-মাংসে গড়া সন্তানকে ত্যাগ করে।"

"তুমি অস্থির হয়ো না। আমি জানি তুমি অসাধ্য সাধন করতে পারবে।"

"তুমি বলছ? তুমি পাশে থাকলে আমি পারব। এখন আমি ঠিক করেছি মেয়েটাকে ম্যানেজারকে দিয়ে চা খেতে ডেকে পাঠাব।"

"কি বলে নেমন্তন্ন করবে ম্যানেজার?"

"তাও আমি ভেবে নিয়েছি। দূর থেকে ওকে দেখে আমার ভালো লেগেছে। আমি একা আছি বিকালটা, তুমি অনেকক্ষণের জন্য বেড়াতে যাচ্ছ। তাই।"

"বেশ। তা না হয় হোল, কিন্তু কথাটা পাড়বে কি করে?"

"তা আমি ম্যানেজ করব। গল্পচ্ছলে একটা এইরকম ঘটনা ও তার ভয়াবহ পরিণামের কথা বলব, যাতে মেয়েটি ভয় পেয়ে যায়। এইভাবে ওর মুখ দিয়েই ওর কথা বলাবার ইচ্ছা।"

হেসে কৃষ্ণ বলেছিল, "জয় হোক মহারাণীর।"

ম্যানেজার যখন মেয়েটাকে নিয়ে এলো, মনে হয়েছিল বেশ তেরিয়া, রোখা ধরনের।

সে বলেছিল, "হঠাৎ আমাকে আপনার ভালো লাগার মানে?"

হেসে অমৃতা বলেছিল, "প্রশ্নটা আপনি করতে পারেন। তবে এটা কি জানেন, কখন, কেন কারো হঠাৎ ভালো লাগে বা মানুষ

ভালোবাসে তার সঠিক উত্তর বোধ হয় দেবতারাও বলতে পারবেন না। তাই ত পুরাণে তাঁদেরও অনেক ক্ষেত্রেই বিপদে পড়তে হয়েছে।"

এতে যেন মেয়েটির চোখের রং পাল্টেছিল। জ্বলন্ত আগুনের রংটা যেন নিবু নিবু ভাব ধরেছিল।

অমৃতা বলেছিল, "বয়সে ত বেশ তফাৎ। তুমি যদি বলি, রাগ হবে?"

"না, তুমিই বলুন। আমার মাসতুতো দিদির বয়সী হবেন আপনি।"

"বেশ ত," বলে অমৃতা চা খাবারের প্লেট এগিয়ে দিয়েছিল। নিজেও নিয়েছিল।

খেতে খেতে নিজের গল্পই অমৃতা করে যাচ্ছিল—কি করে ডঃ রাওর সঙ্গে ভাব হয়েছিল।

একটু এদিক-সেদিক করে বলেছিল, "ভিন্ন জাতের এবং ওর বাবা মত করবেন না জেনে নিজে সরে গিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম সে ভালোবাসলেও রেজিস্ট্রেশন করে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এগুব না। তাতে যদি রাওয়ের মত না থাকে তবে চিরকালের জন্য সরে যাবে।"

"কি রকম তবে আপনি ভালোবাসেন যদি ছেড়েই দিতে পারলেন?"

"তুমি ছেলেমানুষ। সত্যিকার ভালোবাসা শুধু কাছেই টানে না, দূরেও সরিয়ে দিতে পারে।"

অমৃতা দেখল, মেয়েটি মন দিয়ে তার কথা শুনছে। তেরিয়া ভাব কোথায় মিলিয়ে গেছে। একটা দুঃখের ভাব মুখে ফুটে উঠেছে।

'বেচারা এইভাবে পালিয়ে এসে কি শান্তি পাচ্ছে?' অমৃতা মনে বড় ব্যথা পেলো। 'আহা। এই বয়স সাধারণ ছেলেমেয়ের পক্ষে বড় বিপজ্জনক ও দুঃখের। না বুঝে অনেক কিছুর দিকে পা বাড়ায়। নিজেদের মনে করে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। সাময়িক আকাঙ্ক্ষার বশে

নিজেকে দুঃখ দেয় ও অতি আপনজনদেরও বলতে গেলে মনে-প্রাণে শেষ করে দেয়।'

'যেমন এই মেয়েটি করেছে।'

'বাবা-মাকে বুঝিয়ে যদি সে বলত—ঠিক আছে, দু' বছর আমাকে সময় দাও। এর মধ্যে আমি বিয়ে করব না, আর ছেলেটার সঙ্গে দেখাও করব না। তারপর যদি আমার ভালোবাসা থাকে এবং ছেলেটিরও আমার উপর টান থাকে, তবে নিশ্চয়ই তোমরা আপত্তি করবে না। যদি একপক্ষও ভুলে যায়, তাতে ত কথাই নেই।'

'মা-বাবা নিশ্চয়ই এতে রাজী হোত। মনটাও ওদের নরম হোত—আমাদের মেয়ে আমাদের ভালোবাসে বলেই ত আমাদের মনের দিকে তাকিয়ে এই পথ নিয়েছে। হতে পারে, তখনই বিয়ে দিতে রাজী হোত বা দু' বছর পরে দিত। কত শান্তি, আনন্দের মধ্যে সব কিছু হোত।'

"আপনি কি ভেবে সরে গিয়েছিলেন?"

"হিন্দুমতে যখন বিয়ে হতে পারে না, তখন রেজিস্ট্রি করে হতে হবে। না হলে ভেবে দেখ, কি সর্বনাশ হতে পারে। একটা সন্তান হবার পর স্বামী ছেড়ে যেতে পারে। সত্যিকারের সামাজিক বন্ধন ত নেই। তখন সন্তানটার কি পরিচয়? সমাজের অবহেলা, সকলের দূর্ দূর্-এর মধ্যে বড় হওয়া। ভেবে দেখ কত বড় দুর্ভাগ্য। আমি ত ভাবতে পারি না সে কথা।"

বলতে বলতে অমৃতার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

নরম গলায় মেয়েটি বলল, "দিদি, আপনি এত ভাবেন?"

অমৃতা বুঝল, বরফ গলতে আরম্ভ করেছে।

"আচ্ছা দিদি, যদি ছাড়াছাড়ি না হয়?"

"তবুও ত মুশকিল। আইনের চোখে সে সন্তানের কোনো অধিকার নেই বিষয়-সম্পত্তিতে। কথাটা যদি বেরিয়ে পড়ে কোনোভাবে, তবে স্কুলে ভর্তি করতে মুশকিল। মানে সব দিকেই মুশকিল। শুধু লাঞ্ছনা,

গঞ্জনা। কোনো মা কি তা সহ্য করতে পারে? তাই মনে হয় মেয়েরা সাময়িক উত্তেজনাতে কত বিপদে পড়ে, তার কোনো ঠিক নেই। পৃথিবীর অর্ধেক দুঃখ ত এই সাময়িক উত্তেজনার বশে কাজ করার জন্য।"

অমৃতা চুপ করে থেকে বুঝতে চেষ্টা করছিল মেয়েটার মনে সে কোনো রেখাপাত করতে পেরেছিল কিনা।

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে থেকে মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল, "দিদি, আমি মনের মধ্যে বড় অশান্তি পাচ্ছি। আপনাকে সব বলতে চাই। কাউকে বলে বুদ্ধি নিতে পারছি না।"

"তুমি বল আমাকে সব। আমার নিজের কোনো ভাই-বোন নেই। কেন জানি, তোমাকে আমার ছোট বোনের মতো মনে হচ্ছে। আমাকে সব খুলে বল। আমি তোমার ভালোর জন্য সব করতে রাজী।"

মেয়েটি ধীরে ধীরে সব কথা খুলে বলল। এটাও বলল—"আমার মা-বাবা কত কষ্ট পাচ্ছে। আমি মনে-প্রাণে তা বুঝতে পারছি। তাঁদের কাছে যেতে চাইছে মন। এদিকে একেও ত আমি ছেড়ে থাকতে পারব না।"

এইভাবে তার বাবার নাম ইত্যাদি, আর কেন আপত্তি সবই বলল।

অমৃতা বলেছিল, "তোমার বাবার ভালো ব্যবসা আছে। তোমার দুই ভাই ত তোমার চাইতে বেশ ছোট। তোমার স্বামী সামান্য চাকরি করে, এটাই ত অন্তরায়? তোমার বাবা যদি ওকে তাঁর ব্যবসাতে নিয়ে নেন, তবে ত সব ল্যাঠা মিটে যায়।"

মেয়েটি উৎসাহের চোটে অমৃতার হাতটা চেপে ধরেছিল, "দিদি, তবে ত খুব ভালোই হয়। আপনি ওকে দেখুন। ওকে আপনার সবদিকে ভালো লাগবে। আমি এখনই ওকে নিয়ে আসছি। ও ঘরেই আছে।"

"বেশ।"

মেয়েটি নিয়ে এসেছিল ছেলেটিকে। অমৃতার ভালোই লেগেছিল। বি-এ পাশ, সপ্রতিভ, স্থির, ধীর ছেলে।

সেও বলেছিল, "ওর বাবা-মার মনে দুঃখ দিতে আমি চাইনি। কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল।"

অমৃতা বুঝেছিল, অনুশোচনায় দুঃখ পাচ্ছে ছেলেটি।

"জানেন দিদি, আমার বাবা মারা যান হঠাৎ। বড় দুর্দশার মধ্যে আমরা পড়ে গিয়েছিলাম। আমি ও আমার ছোট তিন বোন ছিলাম। মা অসহায়ের মতো সামান্য যা খুদ-কুঁড়ো ছিল, তাই দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালাচ্ছিলেন। আমার পরের বোনটি সঠিক চিকিৎসা না হওয়ায় মারা যায়। আমি টিউশানি করে পাশ করি। ওকে আমি পড়াতে এসেছিলাম।" চুপ করল ছেলেটি।

"আপত্তি হওয়াটা ওদের তরফ থেকে স্বাভাবিক। সেটা ত বোঝ?"

"ঠিকই ত।" ছেলেটা সায় দিয়েছিল।

"আমি বলি কি—এখন এভাবে ভবঘুরের মতো ক'দিন আর চলতে পারবে? তার চাইতে দু'জনে গিয়ে মাপ চেয়ে দাঁড়ালে মা-বাবা নিশ্চয়ই সব দোষ-ত্রুটি ভুলে গিয়ে বুকে টেনে নেবেন। সুত অন্যায় করলেও মাপ চাইলে মা-বাবা সব ভুলে যান, তোমরা বিশ্বাস কর।"

"কি করে এগুবো আমরা? কোনো পথ পাচ্ছি না।"

"আমি যদি পথ করে দিই, তোমরা মেনে নেবে আমার কথা?"

"হ্যাঁ দিদি, যা বলবেন, তাই করব। আপনি আমার আগের জন্মের দিদি ছিলেন।"

"বেশ, তবে শোন।"

অমৃতা সব কথা খুলে বলেছিল,—বলেছিল কাকার কথা এবং সেই করেই ডেকে পাঠানোর বুদ্ধি।

কাকার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারই করেছিল।

বাঙ্গালোর দেখাটা সে যাত্রায় ওদের আর হয় নি। ছেলেটি, মেয়েটি ও কাকা, তিনজনে মিলেই জোর করে ওদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল মাদ্রাজে। ওর বিয়ের সময় বাণীদি যেমন হয়েছিল কনের

ঘরের পিসী ও বরের ঘরের মাসী, অমৃতাও তাই হয়েছিল। খুব ভালোভাবে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। মেয়ের বাবা-মাও ছেলের মতো জামাই পেয়ে খুশী হয়েছিল। বৌ পেয়ে ত শাশুড়ী আত্মহারা।

"অমৃতা, বাঙ্গালোর দেখার চাইতে আমরা এতে অনেক বেশী আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছি।"

"ঠিকই বলেছ। মনের মধ্যে প্রথম বড় ভয় পাচ্ছিলাম, যদি করে উঠতে না পারি। কিন্তু মহারাজের দয়াতে সব ভালো যার শেষ ভালো।"

কলকাতাতে চলে আসার সময় দেখে এসেছে মেয়েটি স্বামী-পুত্র, মা-বাবা সবাইকে নিয়ে সুখী। ছেলেটি ব্যবসাতে ঢোকাতে ছেলেটির মা-বোনেরাও সুখের মুখ দেখেছে। কলকাতায় প্রথম আসার পরে ওখানকার সকলের কাছ থেকে নিয়মমত চিঠি আসত, অমৃতাও লিখত। আস্তে আস্তে নানা দিকে ইণ্টারেস্ট ছড়িয়ে পড়াতে উত্তর দেওয়াটা শিথিল হতে হতে প্রায় থেমেই গেছে। মনেব মধ্যে কিন্তু সকলে তেমনি কাছেই রয়ে গেছে।

॥ পনের ॥

মনের আয়নায় সবই এইভাবেই ধরা থাকে। চিন্তার মধ্যে এত কাছে; কিন্তু বাইরে কত দূর। অমৃতা তাই ভাবছিল—মানুষের বাইরের রূপটা বদলায়, কিন্তু মনটা আজকে কৃষ্ণকে পেয়েছে। সবকিছু ছাপিয়ে কৃষ্ণর কথা, কৃষ্ণর সঙ্গ, তাই যেন তার কাম্য।

অমৃতার মনে হোল সে তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে কৃষ্ণকে পাচ্ছে। সেই স্পর্শ, প্র।.খোলা হাসি, সব যেন তাকে ঘিরে ফেলেছে।

"মিতা, এবার ত ফিরে আসার জন্য বাঙ্গালোরে শুধু যাওয়াই

হোল। এর পরের ছুটিতেই সেখানে যাব। এবার কিন্তু আর পরার্থে দেবী সাজা চলবে না। মাটির মানুষ দু'জনে ঘুরে-ফিরে দেখে আসব।"

তাই গিয়েছিল তারা পরের বছরই। বাণীদি বলত, "এইবেলা তোরা ঘুরে নে। পরে বাচ্চা হলে ত আর সহজ হবে না।"

বাণীদির বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েক বছর। মনে হয়, বোধহয় ওদের ছেলেমেয়ে হবে না।

অমৃতা ভাবে, ওদের জন্মভূমির ওপর কত টান, আর তাছাড়া দু'জনেরই মা-বাবা বেঁচে। তাই ওরা ছুটি পেলেই ছুটতে ছুটতে কলকাতায় চলে যায়। দক্ষিণের বিশেষ কিছুই ওরা দেখে নি। ওরা যখন দেশ থেকে ফিরে আসত, দু'জনের মুখে এমন একটা তৃপ্তির ভাব। তখনই অমৃতার ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠত—'মা আর ক'টা দিন বাঁচাতে পারল না? নিজের কাছে রাখত, যত্ন করত, দেশে-বিদেশে নিয়ে বেড়াত। কিছুই পারল না করতে।'

অজান্তে কি মনের কোণে হিংসে আসত বাণীদিব উপর? ঠিক মনে পড়ে না। নিশ্চয়ই আসত না। না হলে কেন বাণীদির জন্য সে প্রার্থনা করত,—ওর সব ভালো হোক, ও ভালো থাকুক।

সেবার বাঙ্গালোব গিয়ে সেই হোটেলেই উঠেছিল দু'জনে। বেশ লাগছিল সেই মেয়ে ও ছেলেটির কথা মনে করতে। সেবারে খুব ঘুরেছিল দু'জনে।

কর্ণাটক স্টেটের রাজধানী।

"এই শহরটার একটা বিশেষত্ব আছে," বলেছিল কৃষ্ণ। "এখানে বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। কিন্তু জায়গাটার সৌন্দর্য এতটুকু নষ্ট হয় নি। বাগানে বাগানে ভরা। ফুলে ফুলময়।"

"যা বলেছ। আমাদের দেশে এই দু'য়ের সংমিশ্রণ বড় একটা হয় না।"

"এই শহরটা দেখেছ, একেবারে আনকোরা নতুন। যেন মাত্র ফ্যাক্টরী থেকে বেরিয়েছে। পুরোন কোনো কিছুই নেই। তবে এত সুন্দরভাবে প্ল্যান করা যে অভাব ঢাকা পড়ে গেছে।"

কৃষ্ণ রাও অনর্গল বলে চলেছিল। সেদিন সে যেন বলার আনন্দে গিয়েছিল মেতে।

"ষোল শতকে এখানে ছিল একটা মাত্র মাটির কেল্লা। এখানকার নবাব হায়দার আলি সেই মাটির কেল্লাকে ইটপাথরের কেল্লায় রূপ দিয়েছিলেন।"

অমৃতা বলেছিল, "মহারাজার প্রাসাদটা কিন্তু ইংলিশ ক্যাসল্-এর মতো'।"

অমৃতার অবাক লাগছে. তার স্মৃতিশক্তি যে এত, তা সে আগে ভাবে নি। কতদিন আগের কথা। কিন্তু প্রতিটা খুঁটিনাটি পর্যন্ত তার এমনভাবে মনে আছে! এইভাবে যদি সব ভালো কথা, মনে রাখার কথা মনে থাকে, তবে কিসের দুঃখ?

এক গোধূলি লগ্নে ওরা গিয়েছিল ওখানকার প্রসিদ্ধ লালবাগে। সবচাইতে সুন্দর বাগানে। তার পরনে ছিল ফিকে নীল রং-এর মাইশোর সিল্কের শাড়ি। পাড়টা ছিল রুপালি।

কৃষ্ণ ওখানে গিয়ে প্রথম দিনই কিনে দিয়েছিল। ওটা তাড়াহুড়ো করে পরবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে এক দোকানে দিয়েছিল ব্লাউজ করাতে। দর্জিটাও এত ভালো যে ওদের তাড়া দেখে রাত দিন খেটে একদিনেই দিয়েছিল বানিয়ে।

ভাবতেই এখন হাসি পায়। কত ছেলেমানুষই না ছিল।

সেদিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে নূতন নামকরণ হয়েছিল ওর নীল-পরী।

ওর নিজেরই কি বা আর ছিল। সবই ত কৃষ্ণর কিনে দেওয়া।

সেখানে ওরা ঘুরে ঘুরে কত কিছু দেখেছিল—একশ' বছরের পুরনো গাছ, ঝরনা। সুন্দর সুন্দর জলাশয় আলো করে রয়েছে সদ্য

ফোটা কমল। তাছাড়া কত রকমারি গাছ, লতাপাতা, ঝোপঝাড়। বেশ কয়েক একর জুড়ে এই বাগান।

মনে হচ্ছে, আজকে যেন অমৃতা ধরতে চেষ্টা করছে দু' হাতের মুঠোর মধ্যে তার সারাটা জীবন। বিশেষ করে কৃষ্ণর সঙ্গের স্বল্প-পরিসর সময়টাকে।

এই আকাঙ্ক্ষা এমনভাবে ত তাকে কখনও পেয়ে বসে নি।

প্রথম প্রথম এই স্মৃতিভার নামাবার জন্য সে ব্যাকুল প্রাণে ডাকত, "এ বোঝা আমার নামাও প্রভু।"

আর আজ খুঁটিনাটি সবকিছু নিয়ে জড়িয়ে থাকতে মন চাইছে। মনে হচ্ছে, কৃষ্ণ বেঁচে থাকতেও বুঝি এত কাছে তাকে পায় নি। এত আপন করে, এত নিজস্ব করে।

কেউ না কেউ তার ভাগীদার থাকত। কিছু না থাকলেও কৃষ্ণর নিজস্ব চিন্তা।

ওরা দু'জনে সাঁইত্রিশ মাইল দূরের নদী, পাহাড় দেখতে গিয়েছিল। কি সুন্দর দৃশ্য! পাহাড়ের নিচের মন্দিরটাই ওরা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল। শুনেছিল ওপারের মন্দিরের চাইতে নিচেরটা বেশী সুন্দর।

"আমি কিন্তু বাপু, ওপরে উঠতে পারব না।"

"যারা মন্দির দুটি বানিয়েছিল, তারা আগেই জানতে পেরেছিল যে, মিতা ওপরে যাবে না। তাই ত নিচেরটাই ভালো করে বানিয়েছিল।"

কথাটা মিতার এত ভালো লেগেছিল যে, ও কোনো উত্তর দেয় নি। শুধু কান ভরে শুনেছিল।

এখনও তার স্পষ্ট মনে আছে।

সত্যি কৃষ্ণর সঙ্গের কয়েকটা বছর কিভাবে উড়ে উড়ে চলে গেছে। মনেও পড়ে না যে একদিনের জন্যও কোনো সত্যিকারের দুঃখ, কষ্ট বা অশান্তি পেয়েছিল।

তখন মনে হোত পৃথিবীটা এত শান্তির তা সে আগে জানত না। মনে হোত স্বর্গের ছবি আঁকে কেন লোকে আলাদা করে? সে ত এখানেই।

মেয়ে হবার আগে অবধি তু'জনে দক্ষিণের অনেক জায়গাই ঘুরেছে।

"আচ্ছা, তুমি কোনো ছুটিতেই কি আরামে, আয়াসে থাকতে পার না?"

অমৃতা বলেছে, "বসে, শুয়ে, আয়াসে, আরামে তু'জনে কাটাই না কেন এক-আধবার?"

কৃষ্ণ বরাবর এক কথাই বলেছে, "কি জানি। শুধু মনে হয়, বোধহয় বেশীদিন এভাবে তু'জনে দেশ-দেশান্তর দেখে বেড়াতে পারব না। বাধা পড়বে। জানি, এ ভয় অমূলক। কি বল?"

"ঠিকই তা হতে পারে ছেলেমেয়ে হলে কয়েক বছর ইচ্ছে করলেই বেরুনো যাবে না। বড় হয়ে গেলে আবার ফ্রি।"

"হ্যাঁ, তা ত ঠিকই। যতসব অমূলক চিন্তা।"

কৃষ্ণর মনে মেয়েদের জন্য একটা বড় ব্যথা ছিল, মানে আমাদের দেশের মেয়েদের জন্য।

কত সময় বলত, "এই দেশের বেশীর ভাগ মেয়ে বড় অসহায়। আগে সেই সংখ্যাটাই ছিল সব। এখন অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম হয়েছে। তা হলেও, কত আর বল? কিছুই বিশেষ নয়। চোখের সামনে তু-চারজন। অন্ধকারের অন্তরালে ত বলতে গেলে সবাই।"

বলতে বলতে কেমন যেন অস্থির দেখাত তাকে।

অমৃতার সাংসারিক অভিজ্ঞতা বড়ই সীমিত। সমাজের কথা নিয়ে তার মা একেবারেই আলোচনা করতেন না। তাছাড়া অবসর সময় ত আশ্রমে কাটত।

তাই কৃষ্ণকেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মেয়েরা বেশীর ভাগ তুঃখী, তা বেশ বুঝি। কিন্তু তুমি কেন এত উতলা হয়ে পড় এই কথা বলতে বলতে?"

"কারণ আছে, মিতা। বেশ বড় কারণ আছে। ছোটবেলার ঘটনা মনে বড় দাগ কাটে। আমি তখন বেশ ছোট। মা বেঁচে আছেন। আমার ছোট মাসীর বিয়ে হয়েছিল এক গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারে। অর্থের দিক দিয়ে বর্ধিষ্ণু, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল নগণ্য। সবার উপরে চেহারাতে মানুষ, কিন্তু আসলে ছিল পশু।"

একটু থেমে সে বলল, "কি অত্যাচার যে সকলে মিলে ঐ ছোট্ট মেয়েটার উপর করত! আমাদের কাছে আশ্রয়ের আশায় এসেছিল। কিন্তু আমার বাবা ঝামেলার ভয়ে থাকতে দিতে রাজী হন নি। মা'র শত কান্নাকাটিও তাকে টলাতে পারে নি। মা'র চোখের জল দেখে কেন জানি ঐটুকু বয়সেই আমার বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা করেছিল বাবার বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে। তখন মনে হয়েছিল, আমার মা যে এই সংসারের জন্য উদয়াস্ত খেটে চলেছেন, তার উপর সত্যিকারের কোনো অধিকার তার নেই। তবে কেন মেয়েরা বোকার মতো এত করে?"

একটু সময় নীরব থেকে কৃষ্ণ আবার বলল, "তখন বুঝিনি যে তাছাড়া তাদের কোনো পথ নেই। আষ্টেপৃষ্ঠে তারা বাঁধা। সেই জন্যই তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় না। যদি বুঝতে পেরে তারা বিদ্রোহ করে!"

অমৃতা বলল, "তোমার মাসীর কথা বল।"

কৃষ্ণ খুব মৃদুস্বরে বলল, "তার কিছুদিনের মধ্যেই মাসী হঠাৎ মারা যায়। ওরা জানিয়েছিল—অসুখে। সত্যিই কিছু জানি না। মা'র মনে এত লেগেছিল, তার অল্পদিনের মধ্যেই মা শয্যা নেন। আর ওঠেন নি।"

অমৃতা চুপ করে ভাবছিল আর ভাবছিল,—নিজের কথা মনে করে ও দুঃখ পায় কি? তার নিশ্চয়ই আগের জন্মের অনেক পুণ্য সঞ্চয় করা ছিল, তাই ত একের পর একজনকে সে এমনিভাবে পেয়ে গেছে বা যাচ্ছে যে সত্যিকারের দুঃখের মধ্যে সে পড়ে নি।

কৃষ্ণ আবার বলল, "জান মিতা, মেয়েদের কত ত্যাগ স্বীকার করতে

হয়েছে তিলে তিলে, পলে পলে, একটুখানি সত্তা পাবার জন্য। ভাবলেও মনের ভিতরটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।"

"কৃষ্ণ তোমাদের মতো পুরুষের জন্যই ত মেয়েদের এগিয়ে যাবার পথ কিছুটা করে দিয়েছে। তাছাড়া এটা ঠিক,—মাটি কাটতে হয়, পাথর ভাঙতে হয়। সেই স্তূপাকৃতি জঞ্জাল বয়ে নিয়ে যেতে হয়। তবেই ত রাস্তা তৈরি হয়। খুলে যায় এগিয়ে চলার পথ।"

"তাই তো মায়ের সেই অপারগের দুঃখটা ছিল চাপা ভিতরে, তারই শোধ আমি নিয়েছি ঘুরিয়ে। প্রথম থেকেই দিয়েছি, নিইনি। ও সংসার থেকে কিছু নেব না আমি, যে সংসার মাকে দেয় নি।"

"তাই বুঝি আমাকে বিয়ে করতে ব্যস্ত হয়েছিলে?" দুষ্টুমি করে বলেছিল অমৃতা।

"আমার ভালোবাসাকে অমন করে খাটো কোর না। ভালো আমি বেসেছিলাম তোমাকে কোনো কিছু না জেনেই। জানবার পরে বুঝলাম ভগবান আমাকে ভালোবাসেন। তাই ত আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন সবদিকে। অমৃতের ভাণ্ডার নিয়ে তুমি এলে আমার জীবনে?"

সেই কৃষ্ণ কত অল্প সময়ের মধ্যে চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে। কোন্ মহাপাপে স্বর্গের দেবতা এসেছিল এই ধুলোর ধরায়' তাই তাকে চলে যেতে হোল দেবলোকে, স্বস্থানে এত তাড়াতাড়ি।

একথা মনে হলে তার কেমন যেন লাগে। তবে কি মৃত্যুর পরে সে কৃষ্ণকে পাবে না? তা হতেই পারে না। সে সেখানকার উপযুক্ত না হলেও তাকে কৃষ্ণ ঠিক টেনে নেবে শক্তিতে।

' মনে পড়ে, রিণরিণ যেদিন হোল, কৃষ্ণ কি খুশী।

পরে শুনেছিল বাণীদির কাছে,—"তোর বরের যা কাণ্ড, তোর কষ্ট দেখে সমানেই বলেছে,—আমার কিছু চাই না। মিতা যেন ভালো থাকে। ওর কষ্ট ত আমি সহ্য করতে পারছি না। ডাক্তারকে বলেছে, —মিতার কষ্টের আপনি বিহিত করুন।"

মেয়ে হওয়ার পরে ফিরেও তাকায় নি সে মেয়ের দিকে অভিমানে। 'যে এত কষ্ট দিয়েছে মিতাকে, সে আমার শত্রু।'

বাণীদি বলেছিল, "মশাই, নিজেও ত দুঃখ দিয়ে এসেছ।"

"তাই ত বাণীদি মাকে শাস্তি দেবার সুযোগ পেলাম না।"

"তোর জোর কপাল সত্যি।"

একটা বিশেষ দিনের কথা মনে পড়ে গেল অমৃতার। একটা ছুটির দিনে ইউনিভার্সিটির সব প্রফেসার তাদের স্ত্রীদের নিয়ে পিকনিকের ব্যবস্থা করেছিল। খাবার সব তৈরি করে সঙ্গে নেবে। এক-একজনের উপর পড়েছিল এক-একটা কাজ।

অমৃতা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাবে। অতএব খাবার তৈরির থেকে পেয়েছিল রেহাই।

সত্যি কি রেহাই পেয়েছিল ?

"বারে, বেশ মজা, না ? দুটো-একটা গান করবেন। অতএব হাত গুটিয়ে বসে থাক বাড়িতে। কেন ? হাত চালালে কি মুখ চলে না ?"

কৃষ্ণ সোৎসাহে বলেছিল, "ঠিক কথা বলেছ। এ হচ্ছে অন্যদের কাজে ফাঁকি দেবার মতলব। চলবে না, চলবে না।"

অমৃতা চুপচাপ শুনছিল আর বেশ মজা পাচ্ছিল। ওর ওপরেই সব বাক্যগুলো ছাড়া হচ্ছিল, যদিও ও মোটেই এই কথা বলে নি। প্রফেসার এসোসিয়েশন থেকেই এই যুক্তি ঠিক হয়েছিল।

রণেন মাঝখানে গেল চটে, "কি, হচ্ছে কি তোমাদের ? ঐটুকু একটা বাচ্চা মেয়ের পিছনে লাগছ। ওর গুণটা তো তোমাদের নেই, তাই পিছে পড়া। আর তাছাড়া এই কথা ত ও বলেনি।"

"দেখছ কৃষ্ণ, কি রাগ ! ছোট বোনটির গায়ে আঁচড় লাগতে দেবে না দাদা। বেশ, বাবা বেশ। তোমাদের বোনের কিছু করে দরকার নেই। আমি একাই করব। আমার কথা আর কে ভাববে ?"

বাণীদি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বাণীদি এমনিতে খুব হাসিখুশি। কেন যে

হঠাৎ চটে উঠেছিল, অমৃতা বুঝতে পারে নি। ওর মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

তাকিয়ে দেখল, কৃষ্ণ রণেনকে ওর দিকে কাঁচকলা দেখিয়ে বাণীদিকে সঙ্গে করে রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল।

"দাদা, কেন তুমি এরকম বললে? আমি ত যেতামই বাণীদিকে সাহায্য করতে। আমাকে ভরসা করেই ত ও সবার জন্যই ছুটো খাবার করে নিয়ে যাবে কথা দিয়েছে। আমি শুধু মজা করছিলাম।"

"তা কি আর জানি না। তবে তোমার গান প্র্যাকটিস্?"

"ওমা, জান না বুঝি? গতকাল সন্ধ্যাবেলাতে যে ক'টা গান করেছি, তার থেকেই করব।"

"তাই বুঝি? চলো, ছু'জনে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে কি হচ্ছে দেখা যাক।"

গিয়ে দেখেছিল বাণীদিকে কৃষ্ণ সাহায্য করছে, আর ছু'জনে মহা আনন্দে গল্প করতে করতে হাত চালাচ্ছে।

ওদের দেখেই বাণীদি চেঁচিয়ে উঠেছিল, "আয় শীগ্‌গীর এদিকে। বসে পড়, হাত চালা। কৃষ্ণর মতো অপদার্থকে দিয়ে কি কিছু হয়? আরে বাবা, এতে বুদ্ধি লাগে।"

"কি, এতবড় কথা? আমি বলে এত করলাম, আর এখন ছুধে-আমে মিশে গেল। আঁটি হলো ফাঁক!"

সবাই খুব একচোট হেসেছিল। তার পরের দিন চারজনে বেশ ভোরেই খাবার নিয়ে হাজির হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে। বাকীরা সকলে ওখানেই জড়ো হয়েছিল। সকলে একটা বাসে করে চলে গিয়েছিল মহাবলিপুরমে।

সেখানে সুন্দর একটা জায়গা খুঁজে সবাই বসেছিল। তাস খেলা, বাজনা বাজানো, গান, গল্প, কত কিছু যে হয়েছিল। আনন্দের মধ্যে দিনটা কোন্ ফাঁকে যে শেষ হয়ে গেল, বোঝাই গেল না। সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল অমৃতার একটা গান—"চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।"

সত্যিই জ্যোৎস্নাতে সমুদ্রের জল ঝিকমিক করছিল। মনে হয়েছিল প্রকৃতি আনন্দের জোয়ারে মেতে উঠেছে। তার ছোঁয়া সবার মনকে ছুঁয়ে গিয়েছিল।

জেনে, আবার না জেনেও সকলে ওর সুরের সঙ্গে তাল মেলাতে চেষ্টা করেছিল। সবাই একসঙ্গে অমৃতার জয়ধ্বনি তুলেছিল। সেই সঙ্গে কৃষ্ণকে দিয়েছিল অশেষ ধন্যবাদ এরকম স্ত্রী জোটাবার জন্য।

ফিরে এসে সেদিন ওদের চারজনের চোখে ঘুম ছিল না। সারা রাত কত গল্প হয়েছিল।

পরের দিনও ছিল ছুটি। তাই রণেন পালিত বলেছিল, "এই রাতটি আমরা ধরে রাখব আর সব রাতের থেকে আলাদা করে।"

অমৃতার মনে রয়ে গেছে এই রাতটা অম্লান হয়ে।

বাণীদি ও রণেনেরও নিশ্চয় আছে। কৃষ্ণর ?

মনে পড়ে গেল, বেশ কিছুদিন ওদের দু'জনের সঙ্গে দেখা নেই। ভালোই আছে। চিঠি আসে। আছে লণ্ডনে।

কলকাতা চলে আসার বছর তিনেক পরে একটা ভালো চাকরি পেয়ে রণেন বিলেত যাওয়া ঠিক করল। এদের বাবা-মা'রা ততদিনে গত হয়েছেন। পিছুটান কম।

ওকেও রিণিকে নিয়ে সঙ্গে যেতে বলেছিল। অমৃতা রাজী হয় নি। ততদিনে কলকাতা ওর ভাল লেগেছে।

॥ ষোল ॥

মনে হচ্ছিল, আবার পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছে। রিণি স্কুলে ভালো ফল করেছে। নিজেরও চাকরিটা ভালো লেগে গেছে। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ইনস্‌টিটিউটের স্বামীজিকে ভালো লাগে। তাই ও আর যায় নি।

বলেছিল, "বাণীদি, তোমরা ত আসবে। তখন দেখা হবে। তাছাড়া রিণি বড় হলে যাবার ইচ্ছা আছে।"

দু'জনে প্রায়ই আসে। এখানে বাড়ি কিনেছে। আসছে বছর একেবারে চলে আসবে। রিণির সঙ্গে যখন প্যারিসে ছিল, তখন প্রায়ই দেখা হোত। কি আনন্দে যে দিনগুলো কেটেছে ওদের সঙ্গে। ওদের সঙ্গটা বিশেষ করে ওর ভালো লাগে।

কৃষ্ণ যে ওদেরই একজন ছিল।

এখনও সপ্তাহে একটা চিঠি না পেলে টেলিগ্রাম করে, টেলিফোন করে।

ওদের জন্যই ত এত সহজ হয়েছিল ওর রিণির সঙ্গ ধরা ; যা পাগলা মেয়ে, স্কলারশিপ পেয়েও যাবে না গোঁ ধরেছিল।

"আম্মা, তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। কেন, এখানে থেকে কি কেউ বড় হতে পারে না ? যত সব বাজে ধারণা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বোস।"

একেবারে অকাট্য যুক্তি।

অমৃতার মনে পড়ে গেল বাণীদির কথা। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে সব কথা বলল। ওরা ত আহ্লাদে আটখানা।

"এই নিয়ে ভেবো না। আমরা এখনই দু'জনের টিকিটের টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর এদিক থেকে চিঠি পাঠাচ্ছি, তুই তোর দাদার কাছে থাকবি। খরচাপাতি ত তার।"

এই করে দু'জনে চলে গিয়েছিল। রিণি ত বলতে গেলে, অর্ধেকটা ওদেরই মেয়ে। হওয়ার পর থেকে বিলেতে চলে যাওয়া পর্যন্ত রিণি বাণীদির হাতেই মানুষ।

যাবার সময় বলেছিল, "আজ যদি কৃষ্ণ বেঁচে থাকত, তবে কি রিণিকে ফেলে যাই ? ওকে রেখে যেতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে : কিন্তু তোরও ত একটা অবলম্বন চাই। আমরা দু'জন আছি। কষ্টে-সৃষ্টে ক'টা বছর কাটিয়ে নেব। তুই রিণিকে নিয়ে থাক।"

সেই থেকে আস্তে আস্তে মিস্টার ও মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে যায় রিণরিণের প্রাণের বন্ধু সঙ্গীতার জন্য।

এরাই এখন খুব আপন হয়ে গেছে, দরকারে-অদরকারে, অসুখে-বিসুখে ওরাই এসে দাঁড়ায়।

হঠাৎ অমৃতার মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, যদি তার কিছু হয়, রিণরিণের কি হবে ? পরমুহূর্তেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেল মনটা।

—না। এখন আর কিছু ভাববার নেই। রিণি ত আর সেই আগের ছোট্ট রিণি নেই। ওই ত বলতে গেলে তাকে দেখে। উপযুক্ত মেয়ে, রোজগেরে মেয়ে, প্রতিষ্ঠাপন্ন মেয়ে।

—কত অল্প বয়সে কত নাম করেছে। সীগ্ সীর ত নিজের আঁকা ছবি দিয়ে একটা একজিবিসন করছে। কৃষ্ণ দেখ, তুমি যা চেয়েছিলে, আমি সেইভাবেই তোমার মেয়েকে মানুষ করেছি। তুমি বলতে—ওকে মানুষ তৈরি করার ইচ্ছে। দু'পয়সা বেশী রোজগার করল বা কম করল, সেটা বড় কথা নয়। মানুষ, মানে মনুষ্যত্বটাই বড় কুথা।

অমৃতা ভাবতে লাগল—তোমার আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় আমি পূর্ণ করতে পেরেছি। আমি ওকে সব বলেছি। ওর প্যারিস যাওয়া ঠিক হবার আগে ওকে সব বলেছি। ভয় ছিল কষ্ট পাবে। কিন্তু, জানো, তোমার মেয়ে তোমার মতই হয়েছে। তোমার কথাগুলোই আবার নতুন করে, নতুনভাবে ওর মুখে শুনলাম।

"আম্মি, তোমার জন্ম যীশুর মতো। না হলে এমন দিদিমা আমি পেতাম না, আর পেতাম না মহারাজের আশীর্বাদ। মনে হয় বাবা খুব ভাগ্যবান, তাই ত তোমাকে পেয়েছিল। আম্মি, কেন তুমি আগে আমায় বলনি ? বুকের মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলে বলেই বোধ হয়, তোমার শরীর আগের চাইতে কত খারাপ হয়ে গেছে। এখন থেকে বাবা যেমন তোমাকে রক্ষা করে চলত আমি তাই করব। আমি আমার বাবার মতো হব।"

রিণি বরাবরই ভালো। কিন্তু তারপর থেকে ও যেন আরও দায়িত্বশীল হয়ে গেল।

প্রায়ই রিণি বলে, "একটা হাউস্‌কিপার-কাম-রান্না জানা মেয়ে বা ছেলে রাখলে কেমন হয়? তোমার একটু আরাম হয়। আমি ত তেমনভাবে সব দিক সামলাতে পারি না। অনেকটা তোমাকেও করতে হয়। বাবা থাকতে ত তোমাকে এত স্ট্রেন করতে হোত না, যদিও তোমার বয়স কম ছিল। এখন আমার কথা শোন, আম্মি, আমার খুব ইচ্ছা করে সেইভাবে তোমাকে রাখতে।"

শুনে অমৃতার ভিতরটা কেমন করে ওঠে। ফেলে আসা দিনগুলো ত আর কোনমতেই সে ঠিক সেই ভাবে পেতে পারে না। সেই নাটকের আসল নায়কের ত সত্যিকারের প্রত্যাবর্তন হতে পারে না।

মুখে সে বলে, "রিণরিণ, তুই বুঝিস না। তখনকার আমি ত আর এখনকার আমি নই। মাঝে অনেক জল বয়ে গেছে। অভ্যেস গেছে বদলে। তার উপর পশ্চিমে থেকে কাজ করার ইচ্ছা ও অভ্যেস দুটোই পেয়ে বসেছে। তার উপর আমার এমন লক্ষ্মী মেয়ে রয়েছে। কি বা আমার করতে হয়। ব্যবস্থা এমন সহজ সরল করে নিয়েছি আমরা। কি বলিস?"

একটু থেমে আবার বলল, "হাত-পা কোলে করে বসে থাকলে তোর মা কি এত কর্মঠ থাকতে পারত? তাছাড়া তোর মতো সন্তান আমার চোখের সামনে, ওপর থেকে ভালোবাসার জনদের স্নেহ-মমতা। সব মিলিয়ে ভেবে দেখ রিণি, আমার মতো শান্তিতে ক'জন আছে?"

রিণি চুপ করে শোনে, বোঝে, মা তার ব্যস্ততার মধ্যে থাকতে চায়। কাজ করে যেতে চায়। তাতে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না।

তাই রিণ শুধু বলে, "না, ভাবছিলাম ছুটির দিনের জন্য কি কোনো ব্যবস্থা করব? সে দিনগুলিতে আবার বেশী চাপ পড়ে।"

"ছুটির দিনে ত তোর উপর কাজ পড়ে বেশী। সকালে ছাত্র-ছাত্রীরা আসে। তাছাড়া তোর উপর পড়ে দুপুরের রান্না। আমি ত

বড় মেমসাহেবের মতো ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। ফিরি লাঞ্চ টেবিলে বসবার জন্য। রাতের রান্নার বালাই ত কোনো দিনই থাকে না।"

তা ঠিক। রাতের ব্যাপার ত এদিক-সেদিক খাওয়া থাকে। তাছাড়া প্রায়ই দুপুরেরও জুটে যায় সঙ্গীতাদের ওখানে। তাই দেখছ, আমারই বা কি খাটুনি পড়ে?"

এখানেই কথার ইতি হয়েছিল।

অমৃতা ভাবে, মেয়েটা কত ভালোবাসে আমাকে। মা-বাবা সন্তানের কাছে এইটুকুই চায়, স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি যা দিয়ে তাদের বড় করে তোলে।

টাকা ক'টা কে খরচ করল বেশী বা কে কম করল, তা গৌণ।

একদিন কৃষ্ণ বলেছিল, "বল ত মিতা, কেন এমন হয়? কী করে এমন হয়?"

"কি বলতে চাও?" অমৃতা চোখ তুলে চেয়েছিল কৃষ্ণর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে, হাতের বোনা বন্ধ রেখে।"

"না, এই বলছিলাম কি, আমার বাবা কত তফাৎ করে দেখেন আমাকে তাঁর অন্য সন্তানদের থেকে। আমার ভালোমন্দ, বাঁচা-মরা, কোনো কিছুতেই কোনো ইণ্টারেস্ট নেই। একেবারে নির্লিপ্ত। শুধু মাসান্তে দু' লাইনে টাকা পেয়েছেন, সেই চিরকুট। এখন কিছুদিন যাবৎ তাও বন্ধ হয়েছে। মেয়েটা হবার পরে মাসে মাসে টাকা পাঠান বন্ধ হবার পর থেকে। যদিও ওঁদের অবস্থা আমাদের চাইতেও ভালো। কিন্তু আবার দেখি সেই মানুষেরই অন্য সন্তানদের জন্য কত ব্যাকুলতা, কত চিন্তা।"

অমৃতা কি জবাব দেবে? ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্যে সে মানুষ হয় নি।

সে তার মা'র ছিল একমাত্র। সব ভালোবাসা তার মা দিয়েছিলেন তাকে উজাড় করে। তবে এটা ঠিক, সে অনেকের কাছে শুনেছে যে

প্রত্যেকেই চুলচেরা ভালোবাসার ভাগ দেয় না বা দিতে পারে না। বোধ হয়, তারা যে সাধারণ মানুষ, তারই এটা পরিচয়।

মুখে বলল, "জন্ম-জন্মান্তর ত তুমি বিশ্বাস কর। যতটুকু যার পাওনা তার বেশী বোধ হয় সে পেতে পারে না।"

"একদম ঠিক কথা তুমি বলেছ মিতা।" কৃষ্ণ চুপ করে যায়।

পরের দিন গিয়ে যে বিষয়ে লেকচার দেবে, সেই বিষয়ে বই পড়তে থাকে।

বাচ্চার ঝামেলা মিতার, বলতে গেলে, পেতেই হয় নি। বাণীদিই বলতে গেলে মানুষ করেছিল তাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাণীদির হেফাজতে। শুধু রাতটুকু বাদে।

তাও একটু যদি শরীর খারাপ হোল,—ব্যস্। বাণীদি বলত, "থাক্, খুব হয়েছে। তুই ত কত যত্ন করতে পারিস। অসুখ না সারা পর্যন্ত আমার কাছে শোবে।"

চিন্তাটা অমৃতার ঘুরে গেল অন্যদিকে। ঠিকই, চিন্তাকে লোকে নদীর সঙ্গে তুলনা করে। নদীর স্রোতের যেমন গতির ঠিক থাকে না, সেই রকম চিন্তার স্রোতেরও। তবে এটা ঠিক, চিন্তার স্রোতের গতি আরও উদ্দাম। কেন না, মনের মধ্যে তার বাধাহীন সুযোগ। তাই ত সে এক থেকে আরেক পথে কত সহজে অনায়াসে চলে যায়। পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে অক্লেশে চলে যায় গ্রামের মেঠো পথ ধরে।

নদীর জল তত স্বাধীনতা পায় না। তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকটা তাকে বাঁধাধরা পথ দিয়ে বয়ে যেতে হয়। তাই, বোধ হয়, অনেক সময় তার মনের জমানো ক্ষোভ প্রকাশ পায় বন্যার ভিতর দিয়ে।

প্রকৃতির নিয়ম একভাবে চলা। দিনের পর রাত্রি, আবার দিন। সূর্যের আলোর রথে দিন আসে। পূর্ব দিক দিয়ে এসে পৃথিবী পরিক্রমা করে তার বাঁধা রাস্তা দিয়ে পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় নিজের আস্তানার উদ্দেশ্যে। আবার যে তাকে বিশ্রাম শেষে বের হতে হবে একই রাস্তা দিয়ে।

সূর্যের অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠনবতী রাত্রির হয় আগমন। এই নিয়মই তা চলে আসছে পৃথিবীজোড়া।

কিন্তু এর ব্যতিক্রম কি হয় না? হয়।

হঠাৎ একদিন আমরা দেখি, সূর্য আর উঠল না। রাত্রি পুরোপুরি চলে যেতে গেল ভুলে। ঢেকে রাখল পৃথিবীকে আধা আলো, আধা ছায়া দিয়ে।

তখন মনে হয়, নিয়ম না মানতেও ভবিতব্যের এক-এক সময় ইচ্ছে হয়। তাই ত নিয়ম ভেঙে মানুষকে অনেক সময় চলে যেতে হয় অকালে। এটা সবাই জানে বা বোঝে, মানুষকে একদিন যেতে হবে ফিরে যেখান থেকে সে এসেছে।

তবে তার অনেকটাই একটা নিয়ম আছে। তাই ত চার ভাগে ভাগ করা মানুষের জীবন। শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়তা, বার্ধক্য। দেখা যায়, হঠাৎ হঠাৎ তার হয় ব্যতিক্রম।

কৃষ্ণর জীবনটাও একটা ব্যতিক্রম। সুস্থ, সবল, প্রাণচঞ্চল যুবক। হঠাৎ এই ব্যতিক্রমের হোল বলি।

কেন, অমৃতা বোঝে না। মনে হয় মানুষের এত সুখ, তা বুঝি দেবতাদের সহ্যের অতীত। তাদেরও দেখতে ভালো লাগে না যে পৃথিবীতে এসে পড়েছে স্বর্গের এক টুকরো আলো। তাই বুঝি তারা চোখের ওপর হাত রেখে সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, "ওকে সরাও। ভেঙে দাও এই সুখের নীড়।"

হবেও বা। মনের একটা চিন্তা বা অনুভূতি। আর কিছুই নয়। মানুষের তাও ত হতে পারে। ভাবে অমৃতা।

মানুষ ভগবানের অংশ। তাই বুঝি সে অনেক কিছুই সৃষ্টি করতে ভালোবাসে। নূতন করে, নূতন ভাবে। তাই সে দেয় নূতন ব্যাখ্যা। এটা যে তার জন্মগত।

এটাই বোধ হয় ঠিক ছিল তার কপালে—এতদিন তুমি পুরো সংসারী থাকতে পারবে স্বামী-সন্তান নিয়ে। এর বেশী নয়। তোমার

এই পৃথিবীতে আসবার আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল তোমার কপালে। তার নড়ন-চড়ন হবে না। হতে পারে না।

সেই আমোঘ নিয়মে কৃষ্ণর যেন কি হোল। কিছুদিন যাবৎ দুর্বল বোধ করতে লাগল। উৎসাহ কমে যেতে লাগল। তারা তিনজনে হয়ে উঠল উদ্বিগ্ন। বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

কৃষ্ণ অবশ্য বলেছিল, "তোমরা তিনজনে আমাকে পাগল করে দেবে। আমি ত ভালো আছি। একটু যা দুর্বল লাগে। বোধহয়, খাটুনিটা একটু বেশী পড়েছিল। দু'দিন একটা টনিক খেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিছুদিন পরে ও আবার বেশ স্বাভাবিক হয়ে গেল। তা অবশ্য মাত্র কিছু মাসের জন্য। আবার সেই দুর্বলতা।

এবার ডাক্তার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করল পরীক্ষা। সর্বনেশে নাম উচ্চারিত হোল ডাক্তারের মুখে। ক্যানসার।

অমৃতার মনে পড়ে সেদিনটার কথা বড় স্পষ্টভাবে। কারণ না দেখিয়ে বিধাতা দিলেন দণ্ডাদেশ,—"তোমার সুখের দিন শেষ হোল, অমৃতা।" যে অমৃতার কোনোদিন অসুখ বলে কিছু ছিল না সেই অমৃতার হাত-পা গেল ঠাণ্ডা হয়ে। তারপরে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

অনেকক্ষণ পরে তার জ্ঞান এসেছিল বলে বাণীদি বলেছিল। কপালগুণে কৃষ্ণ জানতে পারে নি, আর পারে নি রণেন তার অজ্ঞান হওয়ার কথা।

ওরা আবার চলে গিয়েছিল ডাক্তারের ঘরে। বাণীদি উঠেছিল ধমক দিয়ে,—"এরকম ভেঙে পড়লে চলবে? আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করে যেতে হবে ওঁকে বাঁচিয়ে তুলবার। তোকে হতে হবে পাথরের মতো শক্ত। যদি আমরা সফল নাও হতে পারি, পরের দিনগুলোর জন্য থাকবে আমাদের মনে সান্ত্বনা যে যথাসাধ্য আমরা করেছি। সেদিক দিয়ে কোনো ত্রুটি হয় নি।"

কৃষ্ণ কিছু জানে না। রণেনকে বলেছিল। সেই এসে বলে গিয়েছিল।

আমরা তিনজন শুধু জানলাম। চতুর্থ কারো কাছে একথা যাবে না।

সেইভাবেই তারা চলেছিল। যা কিছু ছিল সব অমৃতা ঢেলে দিয়েছিল ওর চিকিৎসায়।

রণেন, বাণীও প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। ওরা বুঝেছিল বাঁচবে না। কিন্তু—"আমার ভাইয়ের চিকিৎসার যেন কোনো ত্রুটি না হয়।" রণেন বলেছিল, "না হলে যে শেষে আমরা বেঁচেও মরে থাকব।" শেষে ত রণেনকে অনেক ধারও করতে হয়েছিল।

একদিন অমৃতা কেঁদে বলেছিল, "দাদা, তুমি যে পথের ভিখিরী হলে।"

"আমি ভিখিরী হব না ত কি হব? আমার রাজরাণী বোন যে পথের ধুলায়। তার কি করব? আর তা ছাড়া বলতে গেলে, ঐ ত আমার একটা ভাই। আমার সংসারে কে রইল, বুড়ো বাবা-মা ছাড়া? তাঁদের ত যে-কোনোদিন ডাক পড়বে।"

রিণি বাণীদির কাছে থাকত। অমৃতা কোনোদিন ফিরেও তাকায় নি ওর দিকে। একমনে ও শুধু সেবা করেছে। আর করেছে প্রার্থনা, "ভালো যদি কর প্রভু, করে দাও। না হলে, ওকে বিনা কষ্টে নিয়ে যাও। এই কথাটা তুমি আমার রেখো প্রভু।"

ও জেনেছিল, এই অসুখ এতটা এ্যাডভান্স স্টেজে ধরা পড়লে সারে না। ক'টা দিন বেশী থাকা বা ক'টা দিন কম থাকা।

ভগবানের পক্ষে অমৃতার যে প্রার্থনাটুকু রাখা বোধ হয় সম্ভব হয়েছিল, সেটা রেখেছিলেন। এতখানি গ্যালপিং ক্যানসারেও কৃষ্ণ ব্যথার বিন্দুমাত্রও পায় নি। ডাক্তাররা হয়েছিল অবাক। সবাই বলেছিল, অমৃতার প্রার্থনাতেই তা সম্ভব হয়েছিল।

শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে কৃষ্ণ বলেছিল, "মিতা, তোমাকে

কিছুই করে দিতে পারলাম না। তোমাকে পথে বসিয়ে নিঃস্ব করে যাচ্ছি।"

"অমন কথা বোল না। তোমার জন্যই আমি বেঁচে আছি। তোমার জন্য ত আমি জানলাম পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে পাবার। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তুমি থাকবে আমার কাছে, আমার মনে। তাই ত আমি পারব চলতে, পারব তোমার মেয়েকে মানুষ করতে। তুমি শুধু আমাকে বুঝতে দিও, তুমি আমার হাত ধরে আছ।"

কৃষ্ণ আস্তে আস্তে ওর হাতটা ধরেছিল। মুখে ফুটে উঠেছিল একটা শান্তির আভাস।

তারপর সব শেষ।

এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

অমৃতার চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল গড়িয়ে পড়ে নি। ও বসেছিল কাঠ হয়ে। বাণীদি কেঁদে জড়িয়ে ধরেছিল।

সবাই বলছিল, এমনভাবে থাকলে অমৃতা পাগল হয়ে যাবে। না চোখ দিয়ে জল পড়েছিল ওর, না মুখ দিয়ে কথা। ও কাউকে বোঝাতে পারছিল না, সবাই দেহটাকে নিয়ে রয়েছে, কিন্তু ও স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে কৃষ্ণকে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে।

কানের কাছে যেন সে বলছে,—"তুমি ভেব না। আমি আছি তোমার সঙ্গে সঙ্গে, রিণির সঙ্গে সঙ্গে।"

রণেন করেছিল মুখাগ্নি। ওই তো সত্যিকারের দাদার মতো। তারপর ওকে নিয়ে ফিরে এসেছিল ওদের ফ্ল্যাটে। ওখানে সকলের কাছেই অমৃতা যথেষ্ট সহানুভূতি পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন জানি মাদ্রাজ শহর ওর কাছে বিষিয়ে উঠেছিল।

শুধু মনে হোত, এখান থেকে না সরে যেতে পারলে ও পাগল হয়ে যাবে। বাইরে ছিল সে স্থির, কিন্তু ভিতরটা তার ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল।

ক'দিন পরে ও বাণীদিকে বলেছিল, "আমি এখানে থাকলে ঠিক পাগল হয়ে যাব। তোমরা দূরে আমার কোনো কাজ জুটিয়ে দাও।"

"তোর দাদাও তাই রোজ বলে। আর তাছাড়া আমিও আর পারছি না। তোর দাদা কলকাতাতে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে। কাজ পেয়ে যাবে আশা করছি। তখন সবাই আমরা একসঙ্গে চলে যাব।"

"ততদিন ভাবছি এখানে কিছু করি। তোমাদের ঘাড়ে······।"

মুখ চেপে ধরেছিল, "ও কথা অমন করে বলিস না। আম্মি, আমি যে কত ভালোবাসি তোকে, তা কি কোনোদিনই তুই বুঝবি না?"

অবাক হয়ে বাণীদির দিকে ও তাকিয়েছিল। ওর চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

"কি রে, কি হোল? চুপ করে আছিস কেন?"

"জান বাণীদি, ঐ নামে আমায় শুধু আমার মা সবার অজ্ঞাতে ডাকতেন। আমি শুধু একদিন কৃষ্ণকে বলেছিলাম। তুমি অজান্তে এই নাম ধরে ডাকলে। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই মা আমার তোমাকে দিয়ে এই নামে ডাকালেন। বোঝালেন, তুমি তাঁর মতো আমাকে আগলে রাখবে।"

এই বলে অনেকদিন পরে বাণীদিকে জড়িয়ে ধরেছিল আর কেঁদে ভাসিয়েছিল। এমন কান্না বোধহয় কৃষ্ণ যাবার পর কোনোদিন কাঁদে নি।

সেই থেকে ওদের কাছে থাকতে ওর মনে আর কোনো দ্বিধা ছিল না।

বড় ক্লান্ত বোধ করছে অমৃতা।

ধীরে ধীরে সে চোখ খুলল। একি, সন্ধে গড়িয়ে রাত হতে চলেছে। বুঝতেই পারে নি। রিণির সঙ্গে দশটার মধ্যে সকালের খাওয়া সেরে সেই যে এসে বারান্দায় বসেছে আর ওঠে নি।

কি এক ভাবের মধ্যে ছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তারপর সন্ধের প্রস্থান ও রাত্রির আগমন। কিছুই সে টের পায় নি।

ছিল মগ্ন কৃষ্ণর ধ্যানে।

মনে হলো, মনটা বড় তৃপ্ত। ভালোবাসার জনকে কাছে পেলে যা হয়। কিন্তু দুর্বল লাগছে। মাথাটা ধরা ধরা। বোধহয়, এত ঘণ্টা একভাবে বসে থাকার জন্য। বোধহয়, সময়ে চা না খাওয়ার জন্য।

তাড়াতাড়ি উঠতে চেষ্টা করল, পারল না, মাথাটা ঘুরে উঠল। অন্ধকার হয়ে গেছে। বাতি জ্বালান হয় নি। রিণি এলো না এখনও। বড় দেরি হচ্ছে। ওর জন্য কিছু করে নি। সারাদিন খেটে আসবে। সারাদিন ছুটি ছিল। একভাবে বসেই কাটিয়ে দিয়েছে।

পর মুহূর্তেই ভাবল,—ভাগ্যিস বসেছিলাম—তাই ত কৃষ্ণকে এত কাছে পেয়েছিলাম।

দূর থেকে ফ্ল্যাট অন্ধকার দেখে রিণির অবাক লাগল।

তার ফেরার সময় মা বাড়ি থেকে ত কোনোদিন বের হয়ে যায় না। তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। কাজে গেলে আলাদা কথা। আজ ত সারাদিন মা'র ছুটি।

হঠাৎ কি সঙ্গীতারা নিয়ে গেছে? তবে নিশ্চয়ই মা চিঠি লিখে রেখে গেছে। এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে দোতলার নিজের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে দাঁড়াল।

চাবি দিয়ে দরজাটা খুলেই বসবার ঘরের বাতিটা দিল জ্বালিয়ে। বারান্দায় রিণির অপেক্ষায় বসে ছিল অমৃতা।

উঠলেই মাথাটা ঘুরছে, তাই উঠতে পারে নি।

"কি রে, রিণি এলি? তোর অপেক্ষায় বসেছিলাম। ধরে আমাকে একটু ভেতরে নিয়ে যা না।"

"সে কি, আম্মি! তুমি এই অন্ধকারে বারান্দায় বসে আছ?"

হাতের জিনিসপত্তর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে রিণি এসে মাকে জড়িয়ে ধরল।

"কি হয়েছে তোমার, বল আমাকে।"

রিণির কান্নাভেজা গলার স্বরে অমৃতা দেবী বিচলিত হোল। "কিছু ত হয় নি। মাথাটা একটু ঘুরছে, এই যা।"

রিণি অতি সাবধানে মাকে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ব্র্যাণ্ডি এক চামচ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিল।

"মা, তুমি শুয়েই থাক। আমি এখনই তোমাকে গরম ওভালটিন করে খাওয়াচ্ছি"।

মা'র দিকে তাকিয়েই মনে হোল যেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ঠিক আগের মুহূর্তেই কানে ভেসে এসেছিল মা'র দুর্বল স্বর—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।

ওর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। ওর বাবার ত এই নাম। তাকে কি আম্মি চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে? বাবা কি তার শত্রুতা করবার জন্য মাকে নিতে এসেছে?

এরকম কখন সখন হয় ও শুনেছে। না, তা সে কখনই হতে দেবে না। তার আম্মি তার কাছে থাকবে।

দৌড়ে গিয়ে সে টেলিফোনের রিসিভার তুলল ডায়াল করবার আশায়। হা, ভগবান! ফোন খারাপ।

এখন সে কি করবে? কিছু করতেই হবে। ছুটে সে একতলাতে গিয়ে ঢুকল। এমনি কপাল, রান্না করার ঝিটি ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। সবাই বাইরে গেছে।

"শোন মানদা, মা অজ্ঞান হয়ে গেছে। ফোন খারাপ। তুমি একটু মা'র কাছে বোস। মা'র কাছে থাকবে। পোড়া কপাল। সামনেই ফোন করতে যাচ্ছি"।

"তাই যাও, দিদিমণি আমি তোমার মা'র কাছে থাকছি। পোড়া কপাল। আজকের মতো দিনেই এ বাড়িতে কেউ নেই।"

ততক্ষণে রিণি ছুটে রাস্তা পার হয়ে ঐ বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছে।

একজন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আসুন মিস রাও। আপনি ত অমৃতা দেবীর মেয়ে? তাই না?"

আরও, বোধহয়, অনেক কিছু বলে যেতেন ; কিন্তু রিণির মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন।

মুখটা শুকিয়ে গেছে। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা ভাব।

"আমি একটু ডাক্তারকে ফোন করতে চাই। আমার মা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু তাইত, বড় ডাক্তার ত এখানেই বসে —ডঃ নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জী। যা নীল, দেরি করিস না।"

ডঃ নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জী রিণকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। এই মুখ, এই চোখ ভুলবার নয়।

কয়েক মাস আগে একেই তিনি দেখেছেন ট্র্যাফিক কনট্রোল করতে দৃপ্তভঙ্গিতে। স্ল্যাক্স পরা, বুশ শার্ট পরা। চলার ভঙ্গীতে মনে হয়েছিল পৃথিবীটা তার হাতের মুঠোতে।

আর আজ, অসহায় ভাব উঠেছে ফুটে সারা মুখে।

বুঝতে পারলেন ডঃ চ্যাটার্জী, মেয়েটি ওকে চিনতে পারে নি। হতে পারে, সাধারণ পরিবেশে মনে পড়লেও পড়তে পারত।

"আপনি ডাক্তার! ভগবানের কত দয়া! আসুন, শীগ্‌গীর আসুন। মা একা আছেন।" বলতে বলতেই দৌড়ে রিণি রাস্তা পেরিয়ে বাড়িতে এসে এক নিশ্বাসে গিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে। ডঃ চ্যাটার্জী রোগিনীর হাতটা তুলে নিয়ে পালস দেখলেন।

"না, ভয়ের কিছু নেই." বলেই ব্যাগ থেকে ইনজেকশন বের করে একটা দিয়ে দিলেন।

"কেমন দেখছেন, মাকে ?"

ডাক্তার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বড় মায়া বোধ করলেন, আহা, ওর কি কেউ নেই ?

"না মিস রাও, ভয়ের কিছু নেই। উত্তেজনা ও দুর্বলতার জন্য জ্ঞান হারিয়েছেন। এখনই জ্ঞান ফিরে আসবে। আমাকে একটা কলম,—" বলেই রিণির দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, মেয়েটির হাত কাঁপছে।

"কি কাণ্ড, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, পড়ে যাবেন, বসুন।"

"আপনার কলম ?"

"না না, আমার কাছে আছে। ভুলে গিয়েছিলাম।"

স্টেথিসকোপ দিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, "যা বলেছি, আবার তাই বলছি,—ভয়ের কিছু নেই। এখনই জ্ঞান ফিরে আসবে। তখন ওঁকে দুধ বা ঐ জাতীয় কিছু দেওয়া দরকার।"

"আমি এখনই আনছি।"

"আহা, আপনি কেন ? আর কাউকে বলুন না। আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন।"

"মা ও আমি, দু'জনেই ত থাকি। তৃতীয় কেউ ত নেই," বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ডঃ চ্যাটার্জির রিণির দিকে তাকিয়ে এখন মনে হলো, আগের চাইতে স্থির ভাব এসেছে। বোধহয় তাঁর আশ্বাসে।

রিণি এক কাপ গরম ওভালটিন এনে বিছানার কাছের টেবিলের ওপর রাখল। একটুক্ষণের মধ্যেই অমৃতা চোখ খুললেন।

"রিণি, কোথায় গেলি ? কিছু খেয়েছিস ?" বলে উঠতে যাচ্ছিলেন।

ডঃ চ্যাটার্জি ও রিণি দু'জনে ধরে শুইয়ে দিল।

"আপনি উঠবেন না।"

"তুমি একটু ওভালটিন খেয়ে নাও ত।"

কিছু না বলে অমৃতা দেবী ওভালটিন নিলেন।

"ছেলেটি কে ?"

ততক্ষণে রিণির চেহারাতে পড়েছে সত্যিকারের রিণির ছাপ।

"ওমা, তাই ত। তোমার সঙ্গে চেনাই করিয়ে দিইনি। ইনি ডঃ নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জি। আমার মা।"

আধা-বোজা চোখেই বললেন, "বড় খুশী হলাম আপনাকে দেখে। আমার বড় ঘুম ঘুম পাচ্ছে রিণ। আমি ঘুমাই। তুই কিছু খা, আর ডঃ চ্যাটার্জিকেও দিস।" বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

কাঁদ-কাঁদভাবে রিণি বলে উঠল, "একি, ডঃ সাহেব, মা যে ঘুমিয়ে পড়ল।"

"বাঃ, ঘুমাবেনই ত। ইনজেকশানে রয়েছে শক্তি দেবার ওষুধ আর তার সঙ্গে নার্ভ স্যুদিংয়ের ওষুধ। তাই ত এখন কিছুক্ষণ ঘুমাবেন। আপনাব মা ত বললেন আপনাকে খেতে। আমার কথা বিশ্বাস করুন, নিশ্চিন্ত মনে খান ত।"

এখন নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে ওব হঠাৎ মনে হোল, একে ত যেন কোথায় দেখেছে। ঠিক মনে করতে পারছিল না, কিন্তু খুব চেনা চেনা লাগছিল।

"সত্যি, আপনার কথাতে আমি ভরসা পেয়েছি। জানেন, ডঃ চ্যাটার্জি, আমাব ত মা ছাড়া কেউ নেই।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, "আপনার মা ত এখন আধ ঘণ্টার বেশী ঘুমাবেন। আমারও যে বেশ খিদে পেয়েছে। হসপিট্যাল থেকে মাত্র এসেছিলাম বন্ধুর বাড়িতে খেতে। চায়ের কাপ মুখে তুলবার আগেই আপনি গিয়ে ঢুকলেন ঝড়ের মতো। বাকিটা ত সব আপনি জানেন।"

"আমি এখুনি চা বানিয়ে আনছি। তাছাড়া কলেজ থেকে ফেরার পথে রসগোল্লা আর সিঙাড়া এনেছি। তাই নিয়ে আসছি"

"আপনি কলেজে পড়েন?"

মনটা নিশ্চিন্ত হওয়ায় তার স্বভাবসিদ্ধ কথা বলার ঢং বেরিয়ে এলো।

"এই বুড়োধাড়ি মেয়ে কলেজে পড়ে? কি যে বলেন! আমি পড়াই।"

"সে কি! আপনি কলেজে পড়ান? দেখে ত মোটেই মনে হয় না।"

"কেন? মনে হয়, বোকা-সোকা মেয়ে? তাই শুধু কথাই বলে যাচ্ছি। যাই, আগে চা করে নিয়ে আসি। কিন্তু..."

"আবার কিন্তু কিসের ?"

"মানে, মা'র কাছে কে থাকবে ?"

"কেন ? আমি ত আছি। কোনো ভয় নেই। আমার মা'র অসুখ করলেও ত আমি থাকি।"

"আপনার মা আছেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

কোনো কথা না বলে রিণি চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। বসে বসে নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জি ভাবছিল—মা আর মেয়ে শুধু থাকে। আজকাল অবশ্য এই রকম অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। একটা খটকা বাধল। এদের মনে হচ্ছে, তিন কুলে কেউ নেই। তাই ত এদের এই অবস্থায় ফেলে যাওয়া ত তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

বাড়িতে ওর কেউ নেই চাকর ছাড়া। আর পাশের বাড়ির টেলিফোন নম্বর চাকরের কাছে দিয়ে এসেছে। কোনো আরজেণ্ট কল এলে জানাতে। মোটরটা হঠাৎ গতকাল বিগড়ে গিয়ে কি যে মুশকিলে পড়েছে। আসছে কালই অবশ্য দিয়ে যাবার কথা।

সামনে চেয়ে দেখল, ট্রে হাতে মেয়েটি ঢুকল। আবার মেয়েটিকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেট এগিয়ে দিয়ে নিজে কাপটা নিয়ে বলল, "আচ্ছা, ডঃ চ্যাটার্জি, সত্যি করে বলছেন ত ভয়ের কিছু নেই? প্রথমে নারভাস হয়ে গিয়েছিলাম। এখন অনেক স্থির বোধ করছি। না হলে চলবে না। আমাকেই ত সব করতে হবে। মা'র চিকিৎসায় কোনো রকম ত্রুটি যদি হয়, আমি নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না।"

"আপনি কিছু খাচ্ছেন না, মিস্ রাও। একটা কথা বিশ্বাস করুন। আমি ডাক্তার খারাপ নই। আপনার মা'র কোনো কারণে অল্প সময়ের মধ্যে বেশী রকম মেনটাল্ স্ট্রেন হয়েছে। তাতেই এই দুর্বলতা এসেছে। আজ সকালে নিশ্চয়ই নরম্যাল ছিলেন ?"

"ঠিক ধরেছেন। আমি যখন কলেজ যাই, তখনও স্বাভাবিক। উনি পারট-টাইম পড়ান। আগে ফুল-টাইম পড়াতেন। আমি প্যারিস থেকে পাশ করে আসার পর থেকে অত কাজ করতে দিই না। আজকে ছুটি। বললেন, বাড়িতে থাকব। বারান্দায় বসে রোদ পোহাব শীতের দিনটাতে। তারপর ত এসে দেখি এই অবস্থা।"

নীল একমনে শুনে যাচ্ছিল, আর ভাবছিল, কাউকে খবর দিতে বলবে কিনা। ভয়ের কিছুই নেই। রাতে লাইট কিছু খেতে দিলেই চলবে। সকাল থেকে স্বাভাবিক হয়ে যাবেন—এই তার ধারণা।

তবুও একলা এই মেয়েটি এই অবস্থায় থাকবে, তা ত হয় না। নিজে থাকতে পারত। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না।

মনে মনে ঠিক করে ফেলল বন্ধুর বাড়িতে শেষ রাতের কয়েক ঘণ্টা কাটবে। মাঝরাত অবধি এখানেই থাকবে।

"কি ভাবছেন এত, ডঃ চ্যাটার্জি ?"

"না, ভাবছিলাম আপনার মাকে রাতে একটু হাল্কা খাবার দিলে ভালো হোত। আচ্ছা, আপনার আপনজন কাউকে খবর দিলে ভালো হতো। অবশ্য, যদি কলকাতায় কেউ থাকে।"

"ঠিক বলেছেন, আমারো মাথাটা যেন কেমন গুলিয়ে গিয়েছে। আমার বন্ধু সঙ্গীতাকে এখুনি ফোন করে দিচ্ছি। তার মা-বাবা আমার আপন মাসী-মেসোর মতো। মাকে ছোটবোনের মতো ভালোবাসেন।"

"তবে ত খুব ভালো হয়। ওদেরই বরঞ্চ বলে দিন, আপনাদের ছু'জনের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসতে।"

"আপনাকেও কিন্তু অনেকটা রাত পর্যন্ত থাকতে হবে। প্লিজ, থাকবেন বলুন ?"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনাদের নিশ্চিন্ত করেই আমি যাব।"

"তবে আপনার জন্যও অল্প কিছু খাবার আনতে বলি মাসীমাকে ? দেখি টেলিফোনটা যদি দয়া করে।"

॥ সতেরো ॥

ভাগ্যগুণে টেলিফোন চালু ছিল। খুব চট করেই মিঃ চৌধুরীকে রিণরিণ পেয়ে গেল।

"মেসো, মা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। ভাগ্যিস, আমি কলেজ থেকে আসার পরে ডঃ নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জিকে পেয়ে যাই। এসেই উনি একটা ইনজেকসন দেন।"

"কি বলছিস! এতক্ষণ কোনো খবর দিসনি এখন কেমন আছে?"

"জ্ঞান ফিরে এসেছিল। এক কাপ ওভালটিন খেয়ে আবার ঘুমাচ্ছেন।"

"তুই ডঃ চ্যাটার্জিকে ফোনটা দে।"

বিণি দৌড়ে এসে ডঃ চ্যাটার্জিকে নিয়ে গেল।

"আপনার সঙ্গে মেসো কথা বলতে চাইছেন।"

"ঠিক আছে। আমি বলছি।"

"ডঃ চ্যাটার্জি, অমৃতা কেমন আছে? আপনার মতো নামকরা ডাক্তার যে বিণির ডাকে এসেছেন, এতে আমরা যে কত কৃতজ্ঞ।"

"না, তা ঠিক নয়। পাশের বাড়িতে বন্ধুর কাছে চা খেতে এসেছিলাম। মিস রাও বলাতে তখনি ছুটে আসি। না না, ভয়ের মোটেই কিছু নেই। আমি ত আশা করছি কাল সকাল থেকেই নরম্যাল হয়ে যাবেন। একটু দুর্বলতা অবশ্য থাকবে।"

"যাক, বাঁচালেন। ও আমার ছোটবোনের মতো। প্রথম শুনে ত আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। আপনার মতো ডাক্তারের ভরসা। আপনি দয়া করে চলে যাবেন না।"

"ঠিক আছে। মিস রাও আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।"

"মেসো, সব ত শুনলে। এখন তুমি এক কাজ কর। তুমি আব সঙ্গীতা চলে এসো, আর মাসীকে বল—মা'র জন্য লাইট ডায়েট, মানে স্যুপ আর যা হয় কিছু আনতে, আর তোমাদের রাতের খাবার আন্দাজ করে। দু'জনকে ত এখানে থাকতে হবে। তাছাড়া আমার আর ডঃ চ্যাটার্জির জন্যও রাতের খাবার নিয়ে পরে আসবে অনুজের সঙ্গে।"

"ঠিক আছে। আমরা এখনি আসছি, আর জিজ্ঞাসা কর ত ডাক্তার সাহেবকে কোনো বিশেষ ওষুধ আনতে হবে নাকি ?"

"ধর।"

রিণরিণ গিয়ে বলল, "না, এখন কিছু আনতে হবে না।"

ফোন ছেড়ে দিল।

"আপনার মেসো আপনাদের খুব ভালোবাসেন, তাই মনে হলো।"

"ঠিকই। আপনজনেরাও এত ভালোবাসে না। উপর থেকে একজনই চালিয়ে নেয়। না হলে, আপনাব মতো ডাক্তারকে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাওয়া সোজা কথা ? সত্যি কথা বলতে দিন-দুনিয়ায় আমাদের কেউ নেই।"

রিণির গলাটা কেমন ধবে এলো।

"থাক না সে কথা," ডঃ চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, "আ‍পনার মা ত ভালোই আছেন।"

"না, শুনুন—কেন জানি, এখন আমাব সব কথা বলে মনটা হাল্কা করতে ইচ্ছা করছে।"

"বেশ ত। আপনার যদি ভালো লাগে বলুন।"

"আমার মা একমাত্র সন্তান। বাবার কথা ওঁর মনে নেই। আমার দিদিমাই ওঁকে মানুষ করেন। যখন মা বি. এ. পড়ছেন, তখন মাতৃহারা হন। মা যখন এম. এ. পড়ছিলেন, আমার বাবা, ডঃ রাওয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। তিনি প্রফেসর ছিলেন ইউনিভার্সিটিতে। ভিন্ন জাত বলে বাবাকে তাঁর বাবা ত্যাগ করেন।"

"ইস, কি অন্যায় !"

"আরও শুনুন, আমার বাবা মারা যান আমি যখন খুব ছোট। মা আর মাদ্রাজে টি঳কতে পারলেন না। চলে এলেন কলকাতায় বাবার বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে। সেই থেকে আমরা কলকাতায়। সেই মাসীকেই ছোটবেলায় মা মনে করতাম। ওঁরা আমাদের এত করেছেন ও এত ভালোবাসেন।"

"সত্যিই, এত বিপদের মধ্যেও আপনাদের ভালোবাসার লোক এসে দাঁড়িয়েছে। এঁরা এখন কোথায় ?"

"বিলেতে আছেন। বড় চাকরি করছেন। কলকাতায় বাড়ি কিনেছেন। আসছে বছর একেবারে চলে আসবেন।"

"যদি কিছু মনে না করেন—যাঁরা আসছেন ?"

"উনি হচ্ছেন মিস্টার চৌধুরী। ওঁর মেয়ের সঙ্গে আমি পড়তাম। এঁরাও আমাদের দু'জনকে নিজের পরিবারের লোকেব মতো ভালোবাসেন।"

"তা ত বুঝতে পারলাম মিস্টার চৌধুরীর উৎকণ্ঠাতে।"

"কি কাণ্ড, দেখুন। কখন থেকে বকেই যাচ্ছি," রিণি হাতটা রাখল মা'র কপালে আস্তে করে।

মা ত এখনো ঘুমাচ্ছে। খারাপ কোনো লক্ষণ নয় ত ?"

"বললাম ত আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন। আপনি বরঞ্চ যান। প্লেটগুলো ধুয়ে রাখুন। আমি ত রয়েছি।"

বিণি কিছু না বলে কাপ-ডিশগুলো ট্রেতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নীল বসে বসে ভাবছিল—সত্যি, এই পৃথিবীতে কতরকম ঘটনা ঘটছে চারদিকে। কতটুকু আমরা জানি বা জানতে পারি ?

অমৃতা দেবীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া হোল। বাবাকে ত আগেই হারিয়েছিলেন। মাও চলে গেল। পরে স্বামীও চলে গেল। কি জীবন !

নিজের কথা মনে হলো। সত্যি, কত আয়েসে সে বড় হয়েছে। বাবা ভালো চাকরি করতেন। রিটায়ার করেছেন। বাবা-মা দু'জনেই বর্তমান। টাকার চিন্তা কোনোদিন করতে হয় নি। বাবা-মার স্নেহে বড় হয়ে উঠেছে।

বিলেত থেকে পাশ করে সে বড় ডাক্তার হয়ে এসেছে। ছোট ভাই ওকালতি পাশ করে ভালো প্র্যাকটিস করছে। আগেই বিয়ে করেছে। বিয়ে করতে নিজের মত নেই বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। সুখের পরিবাব, শান্তির পরিবার।

দুর্যোগ কি একেবারেই আসে নি? এসেছে। এমন যে তা কেটে যাবার মতো। কেটেও গেছে।

কিন্তু এদের?

"ঐ মেসোরা এসে গেল। আমি যাই নিচে। না হলে বেল বাজার আওয়াজে মা'র ঘুম ভেঙে যাবে।"

ডঃ চ্যাটার্জি শুধু মাথাটা নাড়লেন। একটু পরেই মিস্টার চৌধুরী তার মেয়েকে নিয়ে রিণির সঙ্গে পা টিপে টিপে এসে ঢুকল ঘরে।

দু'জনেরই মুখে চিন্তার ছাপ দেখতে পেল নীল।

"সু, তুই মাসীর কাছে বোস। আমরা পাশের শোবার ঘরে গিয়ে সব কথা আলোচনা করি।"

তিনজনে পাশের ঘরে গিয়ে বসল। রিণি সবিস্তারে সব বলল। ডঃ চ্যাটার্জিও তার যা বলার বলা শেষ করল।

"আপনি যখন বলছেন অমৃতার জন্য ভাববার কিছু নেই, আমরা নিশ্চিন্ত। আপনার মতো নামকরা ডাক্তার, কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি—আপনার নাম শুনে মনে করতাম, আপনি মাঝবয়সী নিশ্চয়। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি ত ছেলেমানুষ। এই বয়সে এত নাম করেছেন?"

ডঃ চ্যাটার্জি একটু হেসে বলল, "ছেলেমানুষ অবশ্য মোটেই নই।"

"আমার ইচ্ছা, অমৃতা ভালো হলে একটা থরো এগজামিনেশন করান। যতই চিন্তার কারণ থাকুক, হঠাৎ এ রকম ত হওয়া উচিত নয়। বয়স ত এমন কিছু নয়।"

"এ কথা আমি আগেই ভেবে রেখেছি।"

পাশের ঘর থেকে সঙ্গীতা এসে বলল, "মাসী জেগেছে। বাবা, তোমার সঙ্গে কথা বলবে।"

"না, না। কথাবার্তা চলবে না। কিছু খেতে দিলে কেমন হয় ডাক্তার ?"

"একটু চা তৈরি করে নিয়ে আসুন, আর ড্রাই টোস্ট।"

"ঠিক আছে। আমরা দু'জনে সকালের জন্যই করে আনছি," বলতে বলতে দুই বন্ধু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে ডঃ চ্যাটার্জিও এসে ঢুকল অমৃতার ঘরে। ডঃ চ্যাটার্জি দেখল, রোগীর চেহারা অনেক স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

মনটা তার পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হোল। সাময়িক উত্তেজনা থেকেই এই আকস্মিক ঘটনাটা ঘটেছিল। তার ডায়াগনোসিস ঠিক হয়েছে। একটু তৃপ্তি বোধ করল। তবে এটাও ঠিক করল যে ভালো হয়ে উঠলে পরীক্ষা ভালো করে করতেই হবে।

"কি কাণ্ড করেছ বলত, অমৃতা ? সাত কাণ্ড রামায়ণ ভাবতে বসেছিলে নাকি ? বড্ড বেশী ভাব তুমি। না হলে, রিণি যাবার সময় সুস্থ মাকে রেখে গেল। ভাগ্যিস ডঃ চ্যাটার্জিকে হাতের কাছে পেয়ে গিয়েছিল। কতবার বলেছি তোমাকে এত খাটবে না, এত ভাববে না," মিস্টার চৌধুরী থামলেন।

অমৃতা ভাবছিল, সত্যিই ত রামায়ণ, তার জীবনের রামায়ণ। লোভে পড়ে মুঠির মধ্যে ধরতে চেয়েছিল তার আনন্দের, সুখের দিনগুলোকে। তাতেই হঠাৎ খারাপ বোধ করেছে। ভালো জিনিসও সীমার বাইরে ফল ভালো দেয় না। বেশী লোভে পড়ে গিয়েছিল। তাই ত হলো এই অবস্থা।

স্মিত হাসি ফুটে উঠল অমৃতার মুখে, "একভাবে বসে সারাদিন নানা কথা ভেবেছি। সেটা একটু বেশী হয়ে গেছে। সবাইকে কত মুশকিলে ফেললাম।"

অমৃতা দেবীর সহজ ভাব ও কথা শুনে মিঃ চৌধুরীর মনের মেঘ গেল কেটে।

বললেন, "তা বেশ করেছ। এখন মনে হচ্ছে, তোমার জন্য ত কাউকে কোনোদিন না দাও ভাবতে, না দাও করতে।"

"এবার মাসী জব্দ। যা বলব আমরা, করতে হবে," হঠাৎ পিছন থেকে সঙ্গীতা বলে উঠল। "তাছাড়া আমাদের কত বড় লাভ হয়ে গেল, ডঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে হয়ে গেল আলাপ। আমি কিন্তু এখন একটা কথা বলতে চাই, মাসী যখন ভালো আছে, অবশ্য সবার সম্মতি পেলে।"

"বেশ ত, বল না। অত ভণিতা কিসের ?" রিণি বলল।

"ডঃ চ্যাটার্জিকে কিন্তু আমি অনেক আগেই দেখেছি। রিণিটা যে কী ? কিছু যদি মনে থাকে। আপনি ট্র্যাফিক কনট্রোল থেকে রিণিকে রিলিফ করেছিলেন।"

তখন নীল মিটিমিটি হাসছে, "আপনার বন্ধু কিন্তু চিনতে পারেন নি।"

"না না। আমারও কিন্তু মনে হচ্ছিল কোথায় যেন দেখেছি। মাথাটা এত গুলিয়ে গিয়েছিল যে, ঠিক প্লেস করতে পারছিলাম না।"

অমৃতা এদের কথা বুঝতে পারছিল না, আর বুঝবার চেষ্টাও করছিল না। শরীরের অবসাদ ভালো কাটে নি আর তাছাড়া মনটা তার তখনও এক স্বর্গীয় আনন্দে ছিল ভরে।

"কি যে সব আগামাথা ছাড়া কথা বলছিস, বুঝতেও পারছি না," মিস্টার চৌধুরী বললেন।

"আগাও আছে, এর মাথাও আছে। পরে এক সময় সব বলব। ঐ বেল বাজল। দেখ ত রিণি নিশ্চয়ই মা ও অনুজ এসেছে। আমি ততক্ষণ চা ঢালি সবার জন্য।"

"মাসীকে কি একটু হেলান দিয়ে বসাতে পারি ?"

"কোনো বাধা নেই, উনি যদি পারেন।"

অমৃতা মাথা নেড়ে পারবে জানাল। সু দৌড়ে গিয়ে পাশের ঘর থেকে কয়েকটি বালিশ নিয়ে এলো। ডঃ চ্যাটার্জি ও সু, দু'জনে মিলে সাবধানে অমৃতাকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল।

"আমি ধরি কাপ, আর তুমি একটু একটু খাও ত লক্ষ্মীটির মতো।"

নীচ থেকে ততক্ষণে দুটি টিফিনকেরিয়ার হাতে অনুজ ঢুকল। পিছনে পিছনে মিসেস চৌধুরী আর রিণি সব শেষে। বিস্তারিত সবই শুনে এসেছেন রিণির মুখে। তাই বেশ সহজভাবেই উনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

"তা বেশ করেছিস বোন, সবাইকে এইভাবে চমকে দিয়ে। না হলে ত কেউ আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। মেয়েরা ত সংসারের জঞ্জাল। এসব হলে তবেই ত এরা একটু নড়ে-চড়ে বসে।"

"এ আবার কি ? তোমার শরীর খারাপ হলে আমি কিছু করি না ?" মিস্টার চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে বললেন।

"এতই যদি তোমার নজর, তবে বলেছ কোনোদিন—অমৃতা ছুটি নাও ? যত সব।"

অমৃতার বড় ভালো লাগছিল এদের দু'জনের কথাবার্তা। তার মধ্যেই বোঝা যাচ্ছিল এদের মনের মিলনের রূপটা।

রিণির বড় ভালো লাগছিল তার আম্মিকে নিয়ে সবাই এত 'ফ স করছে। মনে হচ্ছে, আম্মি যেন কতটুকু। সবাই মিলে ওকে আদর করছে।

ওর ইচ্ছে করছিল, সেও মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে। হঠাৎ মনে হোল—ও ত এখন বাড়ির কর্ত্রী। সবার সুখ-সুবিধা তাকেই দেখতে হবে।

"এত করে আমরা চা আর রুটি-টোস্ট করলাম কি ঠাণ্ডা হবার জন্য ?"

প্রথমেই চা ঢেলে ডঃ চ্যাটার্জিকে দিল।

"সবাই আমার খাটে বসে পড়, আর মেসো চেয়ারে।"

"আচ্ছা ডঃ চ্যাটার্জি, আমরা এত কথা বললে আপনার পেসেণ্টের কোনো ক্ষতি হবে না ত?"

"না মিঃ চৌধুরী, আমি যা ভেবেছিলাম, তাই। এখন উনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দুর্বলতাটা এখনও দু' চারদিন থাকবে। সে ক'দিন একটু শুয়ে শুয়ে থাকলে ভালো।"

"তাই করবে অমৃতা। আমরা দেখব কিন্তু। আপনার কিন্তু একবার করে এসে দেখে যেতে হবে। তারপর ওকে আমরা আপনার চেম্বারে নিয়ে যাব।"

"ঠিক আছে। আমি আসব, মিসেস চৌধুরী।"

অমৃতা খেয়ে শুয়ে পড়ল। বড় ভালো লাগছিল—ওকে ঘিরে সবাই বসেছে। একটু আগে ছিল কৃষ্ণ ঘিরে।

এখন মনে পড়ছে বাণীদি আর দাদার কথা। আসছে বছর ওরা একেবারে চলে আসবে। তখন বেশ হবে।

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে দেখল অমৃতা। বড় ডাক্তার, কিন্তু কেমন অমায়িক। মনটাও বোধহয় ভালো। না হলে, তাকে দেখেই ত আর সব ডাক্তারেরর মতো চলে যেত। সাধারণের মতো নয়। ঠিক তাই ত বুঝতে পারল রিণির অবস্থা। একা এই অবস্থায় ফেলে যেতে পারল না।

সারা জীবনে কত ডাক্তারই ত দেখেছে। এ যেন একেবারে অন্য ছাঁচে ঢালা।

এদিকে বাকিরা সবাই জমিয়ে বসেছে। সকলের মন থেকে দুশ্চিন্তার গুরুভার গেছে কেটে। সঙ্গীতা সবিস্তারে সবাইকে বলল, ডঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে কীভাবে, কোথায় দেখা হয়েছিল।

"আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি, আপনি ডাক্তার হতে পারেন।" রিণি বলে উঠল।

"কেন ? কি মনে হয়েছিল ?"

"মিলিটারী অফিসার সাধারণ পোশাকে।"

"তাই বুঝি ?"

"রিণিকে কি মনে হযেছিল ?" সঙ্গীতা প্রশ্ন করে উঠল।

"কি মনে হয়েছিল ? কি মনে হয়েছিল ? দাঁড়ান—বিদ্যুতের ঝলক।"

"কি বিচ্ছিরি সেকেলে কথা বললেন, ডঃ চ্যাটার্জি," রিণি মুখ বেঁকাল। তারপর বলল, "বিদ্যুতের 'ব'ও নেই, আমি উজ্জ্বল শ্যাম। বলতে পারতেন, মেঘের ছটা।"

"সত্যি কথা বলব ? যা বললাম, মোটেই তা মনে হয় নি। বড় ভালো লেগেছিল দেখে। মনে হয়েছিল—আমাদের দেশের মেয়েগুলো যদি এ দৃপ্ত ভঙ্গির অর্ধেকও পায়, দেশটা বেঁচে যাবে। যত সব ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলা আর এঁকেবেঁকে চলা। সব সময় মনে ভাবছে আমায় দেখ।"

এত বেশী বলে ফেলে যেন নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জি একটু অপ্রতিভ বোধ করল। মাত্র ত এদের সঙ্গে চেনা হয়েছে।

"ঠিকই বলেছেন। আগের কালের মেয়েরা মেয়ে ছিল, শুধুই মেয়ে ছিল—লাজুক নরম। এখন যা হয়েছে—না এদিক, না সেদিক, যাকে বলে জগাখিচুড়ি।"

"এই সেরেছে। বাবার যখন মুখ খুলেছে এ বিষয়ে।"

"আমার কিন্তু একমত ওনার সঙ্গে।" নীলকণ্ঠ বলে উঠল।

হঠাৎ ডাক্তার বলে উঠল, "আমি একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি। এটা একটু আনিয়ে নিলে ভালো হয়। খাবার পরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। সকালে খাবার পর একবার খাবেন। আমি সকালে হসপিটাল যাবার আগে দেখে যাব।"

"ড্রাইভারকে দিয়ে এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি।" অনুজ নেমে গেল।

একটুক্ষণ পরে অমৃতাকে খাইয়ে ওরাও খাবার ঘরে গিয়ে সবাই খেয়ে নিল।

পরের দিন সকালে আসবে কথা দিয়ে ডঃ চ্যাটার্জি উঠে পড়ল।

"আমি আর অমুজ এখানে থাকব—সেই রকম সব ব্যবস্থা করে এসেছি। তুমি ও সঙ্গীতা বাড়ি যাও। পথে ডঃ চ্যাটার্জিকে নামিয়ে দিয়ো। কালকে সকালে আমাদের গাড়িই আপনাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে। পথে এখানে হয়ে যাবেন," মিসেস চৌধুরী থামলেন।

"কেন আবার কষ্ট করবেন?"

"না না, কষ্ট আবার কি?" মিস্টার চৌধুরী বলে উঠলেন। "আপনার কাছে আমরা কত কৃতজ্ঞ।"

সকালের খাবার নিয়ে আসবার জন্য সঙ্গীতাকে ইনসট্রাকসন দিয়ে দিল ওর মা। তিনজনে গিয়ে গাড়িতে উঠল। শারীরিক ও মানসিক ধকল সকলেরই গিয়েছিল।

"দরকার হলে আমাকে ডাকিস," বলে মা আর ছেলে পাশে গেস্ট রুমে শুতে গেল।

"তুই ঘুমো নিশ্চিন্তে।" বলে রিণির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন মাসী।

"ঠিক আছে, আমি শুয়ে পড়ছি। মা ত ঘুমোচ্ছে।"

রাত্তে কিন্তু রিণির চোখে ঘুম নেই। সে এক এক করে তিনটা ছবির কাছে মাথা নোয়াল। অমৃতা প্রত্যেকদিন প্রার্থনা করে তিনটা ছবির কাছে দাঁড়িয়ে।

রিণি কখনও করে, কখনও করে না। এদের তিনজনের মধ্যে বলতে গেলে দু'জনকে ত সে দেখেই নি। মা'র কাছে শুনে শুনে চিনেছিল তাদের। ভালোবেসেছিল আর শ্রদ্ধা করতে শিখছিল।

বাবাকে তার মনে পড়ে। ছোট ছোট কিছু ঘটনা তার মনে আছে। তাকে বাবা আদর করছে, খেলছে। মা'র কাছে বাকিটা তার এত জীবন্তভাবে শোনা যে, মনেই হয় না যে সে বাবাকে

ছোটবেলায় হারিয়েছে। মনে হয়, বাবা যেন সেদিনও ওর আশেপাশে ছিল।

হঠাৎ মনে হোল—মা যেন তাকে ডাকলেন। রিণি ঝুঁকে পড়ল অমৃতার মুখের উপর। না, নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন। ঘুমের মধ্যেই আস্তে আস্তে বলছেন, "রিণি, রিণি।"

॥ আঠারো ॥

আস্তে আস্তে রিণি মা'র গায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। প্রায় সারা রাত জেগে ভোরের দিকে মাসীর ডাকে রিণির ঘুম ভেঙে গেল। সে মা'র বিছানার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

চেয়ে দেখল, মা হাসিমুখে তার মাথার উপর হাতটা রেখেছেন, আর মাসী এক কাপ ওভালটিন হাতে দাঁড়িয়ে।

"আচ্ছা পাগলী মেয়ে। বোঝাই যাচ্ছে সারা রাত জেগে কাটিয়েছিস। এখন ওঠ। না হলে যে তোর মাকে খাওয়াতে পারছি না।"

"কি কাণ্ড!" রিণি সরে বসে মাকে তুলে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল।

"যা এখন। হাত-মুখ ধুয়ে, চুল-টুল ঠিক করে ফেল। একটু পরেই ত ডঃ চ্যাটার্জি, ওরা সবাই এসে পড়বে।"

রেডি হয়ে এসে রিণি দেখল, মাসী রান্নাঘরে রুটি-টোস্ট করতে ব্যস্ত।

"তুমি সরো মাসী। আমি সবার জন্য চা-টোস্ট করে আনছি। তুমি মুখ-হাত ধোও গিয়ে।"

সবাই যখন চা খেয়ে অমৃতা দেবীকে ঘিরে গল্প করছে, সঙ্গীতা এসে হাজির হলো সদলবলে।

ডাক্তার পুরো নম্বর দিয়ে দিল পাশ করিয়ে,—"অমৃতা দেবী এখন ঠিক আমাদের মতো হয়ে গেছেন।"

"কি কথাই বললেন। না মাসী, তুমি বিশ্বাস কোর না ডাক্তারদের কথা। অনেক বাড়িয়ে বলা ওঁদের স্বভাব। তাই তুই বললে এক, বিশ্বাস করবে।"

সঙ্গীতা ডঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে অনেকটা ফ্রি হয়ে গেছে। ব্যারিস্টার সাহেব আসেন নি। সকালে উঠেই ব্রিফ নিয়ে বসেছেন। ফোনে জেনে নিয়েছিলেন অমৃতা ভালোই আছে। ডঃ চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। হাসপাতালে যাবার তাড়া আছে।

"যে ওষুধ দিয়েছি, তাই চলবে। পুরো বিশ্রাম। কোনো চিন্তা নয়। খাওয়া স্বাভাবিক, তবে পুষ্টিকর ও হাল্কা খাবার স্বাভাবিকই ভালো।"

"ঠিক আছে। তাই হবে। চলুন, আপনাকে হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে আমি ও অনুজ বাড়ি যাই। মিস্টার চৌধুরী ও অনুজ বাড়ি থেকে বের হলে আমি তোদের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"ঠিক আছে, মাসী। তুমি আর এবেলা এসো না। সন্ধেবেলা তিনজনে একসঙ্গে এসো।"

"বেশ, তুই রিণি তাড়াতাড়ি খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিস। স্নু বসবে অমৃতার কাছে।"

"বসবার কি কোনো দরকার আছে? আমি ত ডাক্তার সাহেবের মতে, ভালোই আছি।"

এই প্রথম অমৃতা কথা বলল। ওর এভাবে আর শুয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না। কখনও সে শোয় নি বা দরকার পড়ে নি শোবার। তাই কেমন অসোয়াস্তি লাগছিল।

অসুখ যে করে নি তা নয়. বেশী-কম কিছু হয় নি। জ্বর হলেও তাই নিয়ে সবকিছু করেছে। পেটের কষ্ট হলেও তাই। এই পরিস্থিতিটা তার কাছে বড় বেশী অন্যরকম ঠেকছিল।

"তোমার ভাবনা আমাদের একটু ভাবতে দাও ত।" রিণি চুপ করল।

মেয়ের রাতজাগা মুখখানার দিকে তাকিয়ে অমৃতা দেবী আর কিছু বলতে পারলেন না। দুপুরবেলা রিণি ও তার মা অঘোরে ঘুমিয়ে যখন উঠল বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। মিঃ ও মিসেস চৌধুরীর আসবার সময় হয়ে এসেছে।

এইভাবে তিন-চারদিন চলার পরে অমৃতা দেবী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। আবার দৈনন্দিন চাকা ঘুরতে আরম্ভ করল।

তবে মাঝখানে একটা বড় পরিবর্তন হয়ে গেল। ডঃ নীলকণ্ঠ হয়ে উঠলেন এই পরিবারের একজন বিশেষ বন্ধু। সময় পেলেই এখানে চলে আসেন। মা ও মেয়ে, দু'জনেই ওর প্রতীক্ষায় থাকে। মনে হয় যেন এতদিনের একটা বড় ফাঁক বুজে আসছে।

এই সংসারে সৃষ্টিকর্তাই নিয়ম করে দিয়েছেন, ছেলে মেয়ে মিলে চলবে, চালাবে। দুটিরই প্রয়োজন।

কৃষ্ণ যাবার পর তিন বছরের মধ্যেই রণেন ও বাত্রী চলে যায় বিলেতে। তারপর থেকে পুরুষ ছাড়াই এরা চলছিল। অভ্যেসও হয়ে গিয়েছিল। মনেও আসে নি, এর ব্যতিক্রম দরকার।

হঠাৎ অজান্তেই অমৃতা দেবী সেটা বুঝতে পারলেন নীলকে পেয়ে।

ছেলেটা বড় আপন হয়ে পড়েছে। কখনও ভাবেন—এটা কি ঠিক হচ্ছে? পরের ছেলে দূরের লোক, হঠাৎ দূরে সরে যাবে। আপনই চলে গেল দূরে, বহু দূরে। একবার ফিরেও তাকাল না।

নীল ঘরে ঢুকেই অমৃতা দেবীকে যেন কেমন অন্য রকম দেখল। যেন মনে মনে অনেক দূরে সরে গেছেন, যদিও সামনেই বসা।

"কি হয়েছে, আপনার? আমাকে বলুন।"

"কিছু না ত। শুধু এক এক সময় মনে হয়, মায়া বাড়ানো ঠিক নয়। আবার ধাক্কা খেতে হবে।"

"মানে?"

"তুমি পরের ছেলে। চলে যাবে দূরে। সেটাই ত স্বাভাবিক।"

"একথা কেন ভাবলেন ? আমি ত কলকাতাতেই থাকব। এটাই আমার কর্মস্থান। আপনাদেরও তাই। ছাড়াছাড়ি হবার ত কোনো কথাই নয়।"

একদিন ডঃ চ্যাটার্জি বলল, "আমাকে নীল বলে ডাকবেন। আমার আপনজনরা তাই ডাকে। আপনাদের কাছে আমি তাই হতে চাই।"

বড় ভালো লেগেছিল কথাটা শুনে। চেঁচিয়ে ডেকেছিলেন রিণিকে, "শোন এসে, কি সুন্দর কথা বলেছে ও।"

"কি হয়েছে, আম্মা ?" রিণি চুল বাঁধতে বাঁধতে এসে ঢুকেছিল ঘরে।

"এখন থেকে ও আমাদের নীল, শুধু নীল। সামনে কিছু থাকবে না ; পিছনেও না।"

অমৃতা দেবী বড় তৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন।

"আমিও কিন্তু তাই ডাকব। বড় সুন্দর নামটা আপনার।"

"বেশ।"

নীলের ইচ্ছে করছিল বলতে—আমি 'তুমি'ও হতে···

কিন্তু ঠিক সাহসে কুলোল না। তাই এ যাত্রা গল চুপ করে।

অমৃতা দেবী অবশ্য 'তুমি' আরম্ভ করেছিলেন। রাতের খাবার ওরা তিনজনে, বলতে গেলে, রোজই একসঙ্গে খেত। এক-আধ দিন পড়ত ছেদ।

সঙ্গীতাদের বাড়িতে কখনও নীল যেত, কখনও যেত না। তার সবচাইতে ভালো লাগত এই দু'জনের সঙ্গে থাকতে।

অমৃতা দেবীকে দেখলে তার মনে পড়ে যেত নিজের কাকীমার কথা। নীলের যখন অল্প বয়স, তখন কাকা মারা যান। অল্পদিনের মধ্যে কাকীমাও মারা যান। অনেকটা অমৃতা দেবীর মতো ছিলেন

নির্লিপ্ত। মা'র চাইতেও কাকীমাকে সে ভালোবাসত। সে অনেক-দিনের কথা।

আশ্চর্য লাগে, দু'জন মানুষ যাদের পরস্পরের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, তাদের ভাবে, ভঙ্গিতে, চিন্তাধারায় কি করে এত মিল থাকতে পারে।

সবই সম্ভব এই পৃথিবীতে। এটাও বোধহয় একটা অদৃশ্য বন্ধন, যা নীলকে অমৃতা দেবীদেব এত সহজে কত কাছে নিয়ে এসেছে।

সারাদিনের পরে রাত্রেই ডাক্তারদের হয় ছুটি। তাই রাতের শোতে সিনেমা বা থিয়েটার বা সঙ্গীত আসরে যাওয়া আরম্ভ হোল।

অমৃতা দেবীর জীবনে এ যেন নতুন অধ্যায়। এ সবের কাছ থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন।

বিণি যেত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে। তাতে কোনোদিন বাধা দেন নি। নিজের ভালো লাগে না, তাই খুবই কম যেতেন। এখন নীল বললে না করতে পারেন না। ভালোই লাগে তিনজনে গেলে।

এইভাবে আস্তে আস্তে রিণ ও নীলের মধ্যে 'আপনি'র ব্যবধানটা গেল চুকে। ওদিকে সঙ্গীতার দাদা আসবে কয়েক মাস পরে। সবাই দিন গুনছে। তারপর হবে সঙ্গীতার বিয়ে।

সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। মানুষ ভাবে এক, আর হয় এক। কত জল্পনা-কল্পনা। কতদিনের কত চিন্তার উৎস, সব নিমেষে ছত্রাকার করে বিধাতা বোধহয় বড় আনন্দ পান। কে বলে তাঁকে আনন্দময়? কে যে নামটা দিয়েছিল!

চৌধুরী পরিবার যখন আনন্দ উৎসবের মধ্যে ছিল, হঠাৎ একটা ছোট কাগজ দিল সব ওলটপালট করে।

চৌধুরী বংশের বড় সন্তান, যার আসার ওপর সঙ্গীতার বিয়ের দিন নির্ভর করেছিল, সে হঠাৎ জানাল, সে নিজেই ওখানে মেম বিয়ে করেছে এবং খুব শীগ্‌গির তাদের আসা সম্ভব নয়। অবশ্য বাবা-মার আশীর্বাদ সে চেয়েছিল ও ভাই-বোনের প্রীতি।

মিঃ ও মিসেস চৌধুরীর জীবনে সে রকম আঘাত কোনোদিন আসে নি। মা-বাবা সময়ে মারা গিয়েছেন। তাঁদের হারান দুঃখের, কিন্তু সেটা জগতের নিয়ম। তাই সেই দুঃখ সহ্যের মধ্যে যদি তা অকালে না হয়।

তাই বোধহয় এখন দু'জনে একেবারে বসে পড়লেন। মনে হল, দু'জনের সামনে বুঝি শুধু অন্ধকার। এতবড় আঘাত যে ছেলে দিতে পারে স্বপ্নেও ভাবেন নি।

বড় ছেলে এসে পাশে দাঁড়াবে। বয়স হচ্ছে। কত বড় সহায়। বৌ আসবে। শাশুড়ীর হাত থেকে নেবে সংসার, যেমনটি নিয়েছিলেন মিসেস চৌধুরী তাঁর শাশুড়ীর হাত থেকে। সব গোলমাল হয়ে গেল।

যোগ-বিয়োগে হয়ে গেল ভুল। দুইয়ে দুইয়ে চার করেছিলেন। হয়ে গেল তিন।

সঙ্গীতা ছুটে গিয়ে ফোন ধরল, "রিণ, শীগ্‌গির আয় মাসীকে নিয়ে। বাবা-মা কেমন করছেন।"

"সে কি? ডাক্তারকে জানিয়েছিস? ডঃ চ্যাটার্জিকে সঙ্গে নিয়ে যাব?"

"না না। ডাক্তারের কোনো দরকার নেই। তোরা দু'জন যত তাড়াতাড়ি হয় চলে আয়। অনুজ বোধিকে আনতে চলে গেছে।"

"কিছু বুঝতে পারছি না।"

ততক্ষণে রিণির কানে সঙ্গীতার কান্না ভেসে এলো আর ফোনটা ওদিক থেকে রেখে দেওয়া হোল।

অমৃতা দেবী রান্নাঘরে ছিলেন ব্যস্ত। আজকে রাত্রে বাইরে না গিয়ে তিনজনে, মানে নীলকে নিয়ে ওরা বাড়িতে খাবে, গল্প-গুজবে কাটাবে, এই প্ল্যান ছিল।

কিছু ঠিক বুঝতে না পেরে রিণি চেঁচিয়ে উঠল, "আম্মি, রাখ তোমার রান্না। শীগ্‌গির এসো।"

"কিরে, কি হোল? পাগলের মতো চেঁচালি কেন?" বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠেছে একেবারে।

"জানি না, কি ব্যাপার। সু কাঁদছে, মাসী, মেসো কেমন করছে।" বলতে বলতে রিণরিণের চোখেও জল দেখা দিল।

অমৃতা দেবী বুঝলেন একটু আগে যে ফোন এসেছিল, তাতেই এই খবর এসেছে।

"এ রকম করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে? তুই ঘরগুলো বন্ধ কর। আমি গ্যাস বন্ধ করে আসছি।"

একটু পরে দু'জনে এসে দাঁড়াল সঙ্গীতাদের বাড়িব দরজার বাইরে। সারা পথ মা-মেয়েতে কোনো কথাই হয় নি। এখন যেন হঠাৎ দুজনে উপলব্ধি করল একটা অসহায় ভাব। ঘরে ঢুকে কি দেখবে, কি জানবে!

অমৃতা দেবীই এগিয়ে গেলেন। মিঃ চৌধুরী শুয়ে আছেন চোখ বুজে। মিসেস মুখ ঢেকে বসে আছেন। সঙ্গীতা বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, মনে হোল, জোর করে কান্নাটা ঠেলে ভিতরের দিকে রাখছে।

আওয়াজ পেয়ে মিঃ চৌধুরী চোখ খুললেন। মুখে কোনো কথা নেই, না চোখে জল। কয়েক ঘণ্টাতেই মনে হোল বয়সটা বেশ বেড়ে গেছে। চটপটে তুখোড় ব্যারিস্টারের বিশেষ কিছুই যেন পাওয়া যাচ্ছে না।

কি এমন হতে পারে?

অমৃতা দেবীর হাতে কেবলটা দিলেন তুলে।

চোখ বুলিয়ে নিয়ে রিণিকে দিলেন পড়তে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন মিসেস চৌধুরীকে।

"দিদি, আমার দিকে তাকিয়ে মন স্থির করুন। আমার আপনজনেরা এমন জায়গাতে চলে গেছে, যেখান থেকে কোনোদিন আসবে না। আমি গেলে তবে দেখা হবে। সেই আমি দাঁড়িয়ে

থেকেছি, চলেছি, সবকিছু করেছি, করছি। আজ যে অভাব অনুভব করে আপনারা ভেঙে পড়েছেন, হতে পারে যতটা নির্মম মনে হচ্ছে, ততটা ভবিষ্যতে মনে নাও হতে পারে।"

একটু থেমে, আবার বললেন, "এখন ওরা মনে করছে, ওখানে থাকবে। মত বদলাতে পারে, চলেও আসতে পারে ভবিষ্যতে। কি হবে কে বলতে পারে। তাছাড়া আপনাদের সঙ্গীতা রয়েছে, অনুজ রয়েছে। ওদের ওপর কর্তব্য রয়েছে, নিজেদের ওপরও রয়েছে কর্তব্য। আর রয়েছি আমি ও আমার মেয়ে।"

এই প্রথম অমৃতা দেবী মিঃ চৌধুরীর পায়ে হাত রেখে প্রণাম করলেন, "দাদা, এই ছোট বোনটার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে শক্তি ধরুন", অমৃতা দেবী থামলেন।

ওঁর কথায়, মুখের ভাবে কি যেন ছিল। মিঃ চৌধুরী উঠে বসলেন, "বোন, যা বললে, সবই বুঝি। কিন্তু মন যে মানে না। যে এসে পাশে দাঁড়াবে বলে দিন গুনছি···" হঠাৎ থেমে গেলেন।

বোঝা গেল তিনি নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করছেন।

"আপনারা ত আমার মতো পোড়-খাওয়া নন। মাকে সহায় করে চলেছিলাম। নিজের পায়ে দাঁড়াবার আগেই উনি চলে গেলেন। তারপর এক এক করে···। সবই ত জানেন। এই সংসারে আমরা এসেছি পরীক্ষা দিতে। আমাদের যে সব ক'টা পরীক্ষাই পাশ করতে হবে দিদি। আমরা কি আর সকলের মতো ? আমরা যে তাঁর বড় আদরের সন্তান। আমি মনে করি, আমি বিশ্বাস করি।"

রিণি অবাক হয়ে মা'র কথাগুলো শুনছিল আর ভাবছিল, মহারাজের সার্থক নাম দেওয়া 'অমৃতা'।

মা'র কথাগুলো যেন মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। এই রোজকার দেখা পৃথিবীর নয়।

সত্যিই, অমৃতা দেবীর কথাগুলো স্বামী-স্ত্রী, দু'জনের মধ্যেই

শান্তির প্রলেপ লেপে দিল। তাঁদের অস্থিরতা আস্তে আস্তে থেমে এল। পরিবেশটা দুঃখের হলেও স্থিতিশীল হোল।

চোখের ইশারায় সঙ্গীতাকে অনুজ ও বোধিকে নিয়ে পাশের ঘরে যেতে বললেন। রিণিও উঠে গেল।

অমৃতা চৌধুরী দম্পতির কাছে বসে নিজের জীবনের কথা, সেদিন কত কাছে কৃষ্ণকে অনুভব করেছিল, নানা ঘটনার কথা, সুখের-দুঃখের কথা বলতে লাগলেন।

সংসারের নানা কথা, উনি যা জানেন, খুব কম লোকেরই তা জানবার সুবিধা হয়। বেশীর ভাগ নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই জানে। অমৃতা দেবী নানা রকম সোশ্যাল কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে ত ছোট থেকে ওতপ্রোতভাবে। তাই মানবজীবনের দুঃখের দিকটাই বেশী জেনেছেন ও দেখেছেন।

"জান অমৃতা, মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। তাতেই ত আমরা দুঃখ পাই। তাই করে দেয় আমাদের শেষ।"

"তা ঠিক, কিন্তু এখন আপাতদৃষ্টিতে যা অধিক মনে হচ্ছে, দুঃখের মনে হচ্ছে, হতে পারে পরে দেখা যাবে, এর থেকে ভালো কিছু হোল। আবার আপনাদের মনের ফাঁকটা এমনভাবে ঢেকে গেল যে, আজকের এই আঘাতটার চিহ্ন কিছুই রইল না। শুধু একটা স্মৃতি ছাড়া।"

॥ উনিশ ॥

বাইরে মোটরের আওয়াজ পাওয়া গেল।

"কে আবার এই সময়ে এল রাতে?"

"আমি দেখছি," অমৃতা দেবী বাইরে এসে দেখলেন নীল ওদের সেখানে না পেয়ে সোজা এখানে এসেছে। জানে, এই বাড়িতেই ওরা বেশীর ভাগ আসে।

"হঠাৎ আপনারা এখানে ? সবাই ভালো ত ?"

"হ্যাঁ। তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

রিণরা গম্ভীর মুখে যে ঘরে বসেছিল, সেখানে নীলকে পৌঁছে দিয়ে অন্য ঘরে ফিরে এলেন।

"নীল এলো না ? ওর ত তোমাদের এখানে খাবার কথা। এরকমভাবে হাত-পা ছেড়ে বসে থাকলে ত চলবে না। তোমাদের খাবার···।"

অমৃতা দেবী মাঝপথে থামিয়ে দিলেন, "না দিদি, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমরা কি আপনার পর ?"

"না, তা নয়। তবে নীল, বোধি ওরা ত আছে।"

"আমি রিণকে নীলের সঙ্গে আমাদের ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিচ্ছি। রান্না সব করাই আছে। বেশী করেই করেছিলাম। কাল সকালে কাজে যাবার পথে আপনাদের দিয়ে যাব বলে।"

সেদিন সকলে একসঙ্গে খেয়েছিল। একটা থমথমে ভাব ছিল। মানুষের মন কি সহজে শান্ত হয় ? না শান্তি পায় ?

রাতে নীলের সঙ্গে অমৃতা ও মেয়ে ফিরে এল নিজেদের বাড়িতে। অমৃতা দেবীকে বিশেষ করে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। নিজের দুঃখের চাইতে আপনজনের দুঃখে উনি বেশী কাতর হন। মা'র কাছ থেকে যে নির্ভরশীল মনটা উনি পেয়েছেন যা তাঁকে শত দুঃখের মধ্যে চালিয়ে নিয়েছে তা ত উনি কাউকে দিতে পারেন না।

তাই অসহায়ের মতো সান্ত্বনা দেন। বোঝেন সময় ছাড়া সত্যি-কারের সান্ত্বনা হতে পারে না।

"আম্মি, তুমি শুয়ে পড়। আমি সব দরজা দেখেশুনে শোব। বড় হয়রান লাগছে, না ?"

"ঠিকই বলেছিস। আমি শুই। ঘুম ত সহজে আসবে না জানি।

"তুমি এত চঞ্চল হচ্ছ কেন ? তুমি কত স্থির।"

"ওদের দুঃখটা আমার প্রাণে বড় বাজছে।"

"কি করে যে ছেলেমেয়েরা মা-বাবার মনে দুঃখ দেয়, যে বাবা-মা এত করে, আমি বুঝতে পারি না। ওরাও ত একদিন বাবা-মা হবে এবং এই দুঃখ পেতে পারে।"

রিণরিণ মা'র পাশে শুয়ে মা'র হাতটা ধরে কত কথা বলে যাচ্ছিল অনর্গল।

অমৃতা দেবী ছোট ছোট উত্তর দিচ্ছিলেন। মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ুক। সকালে উঠে ত কলেজে যাবে, তাছাড়া টিউশনি আছে। উনি ক'দিনের ছুটি নেবেন বলে এসেছেন। ক'টা দিন ওদের কাছে কাছে থাকবেন।

"মিঃ ও মিসেস্ চৌধুরীব একটা পরিবর্তনের বিশেষ দরকার।" একদিন নীল বলল। "মনের মধ্যে এই দুঃসহ বেদনা নিয়ে একই পরিবেশে ওঁরা ঠিক সুস্থ মন ফিরে পাচ্ছেন না।"

সবাই সায় দিল।

"কি করা যায়, বল ত?" বোধি বেশ চিন্তিতভাবে তাকাল।

এখন সকলের মধ্যেই দূরত্বটা গেছে কমে। সবাই তুমির পর্যায়ে চলে এসেছে।

"আমি বলি, বোধি, তুমি ক'দিনের ছুটি নিয়ে সবাইকে অন্য কোন না-দেখা জায়গাতে নিয়ে যাও। হাইকোর্ট ত বন্ধ হোল?"

"ঠিক বলেছ নীল। বাবা-মাও তাই লিখেছেন। ওঁদের ওখানে যাবার কথা লিখবেন, ভাবছেন।"

"আমার মনে হয়, তার চাইতে নতুন পরিবেশে গেলে ভালো হবে। তোমার বাবা-মা'র কাছে গেলে ছেলের আলোচনাই বেশী হবে।"

নানা আলোচনার পর দার্জিলিং-এ যাওয়া ঠিক হোল।

গরমের সময় হয় পাহাড়, না হলে সমুদ্রের ধার।

সঙ্গীতা বলেছিল—"পুরীতে গেলে সব সুবিধে হবে না। বড় শান্ত জায়গা। দার্জিলিং অনেক বেশী জীবন্ত। বিশেষ করে এই সময়। বাবা-মা'র মন অন্য দিকে যাবার সুযোগ পাবে।"

"সবাই বেশ জোট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমার কি হবে?" অনুজ বলেছিল।

"কি যে ছাই-পাঁশ বলিস।"

"তা কেন হবে দিদি? ঠিকই বলেছি। বাবা, মা, মাসী—বাস একজোট। দিদি, বোধিদা—বাস একজোট। খতম। আমি বাবা, একা একা কি করব?"

"অত ভাবছ কেন? তোমার জুটি ওখানেই পেয়ে যাবে। চোখ দুটো খোলা রেখো, তবেই হবে," হেসে নীল বলল।

"আমার তাতে মাথা ব্যথা নেই," হঠাৎ অনুজের গলাটা ভারি হয়ে এলো। "আমি, দেখো, বিয়েই করব না। মা-বাবাকে দেখব।"

"জিতা রহ বেটা।" বোধি দিল ওর পিঠ চাপড়ে।

তারপর কথা উঠল রিণির। ও পেন্টিং-এর একটা একক একজিবিশন করবে শীগ্গির ফাইন আর্টসে। তাই এই সময়টা ও কিছুতেই নষ্ট করতে পারে না। অনেক ছবি আঁকা বাকী আছে।

তাই ঠিক হোল, রিণি কলকাতাতেই থেকে যাবে। অমৃতা দেবী ওদের সঙ্গে চলে গেলেন দার্জিলিং-এ। এই পরিস্থিতিতে চৌধুরীদের সঙ্গে থাকা বিশেষ দরকার।

বাড়ির মালিক একতলায় থাকে সস্ত্রীক। তাঁরাই দরকার মতো রিণিকে দেখাশুনা করবার প্রতিশ্রুতি দিল অমৃতা দেবীকে।

"মা'র কাণ্ড! আমাকে আবার কে দেখবে? আমি ত সবাইকে দেখে বেড়াতে পারি," রিণি বলেছিল।

রিণের কথা অগ্রাহ্য করে চুপে চুপে অমৃতা নীলকেও বলেছিল সেই কথা।

একদিন সবাইকে ট্রেনে তুলে দিয়ে রিণি আর নীল ফিরে এলো বাড়িতে। নীল বেশ বুঝতে পারছিল, মুখে না বললেও, মা যাওয়াতে রিণি বেশ মুষড়ে পড়েছে। ফেরার পথে বলেছিল, "চল, হোটেল থেকে খাবার কিনে বাড়িতে গরম করে খাওয়া যাবে।"

ছোট্ট উত্তর দিয়েছিল রিণি, "বেশ ত।"

মাকে ছেড়ে বলতে গেলে তার এই প্রথম থাকা। বাড়িতে বসে বড় খালি খালি লাগছিল। সেদিন কথাবার্তা তেমন জমে নি। নীল বুঝেছিল, ও একা থাকতে চায়; তাই খাবার পরই পরের দিন রাতে আসবে বলে চলে যায়।

সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকলেও রোজ রাতে ওরা একসঙ্গে খায়। কখনো ঘরে, কখনো বাইরে। কত গল্প, যার কোনো শেষ নেই।

রিণির বড় ভালো লাগে নীলের সঙ্গে কথা বলতে। বড় আনন্দের মধ্যে ওদের দিনগুলো কাটতে লাগল।

রিণি দেখল, নীল ডাক্তার হলে কী হবে, ছবির জগতের বিষয়ে বেশ ওয়াকিবহাল। ও ত আর জানে না, ওকে ভালো লাগার জন্যই এ বিষয়ে নীল যথেষ্ট পড়াশুনা করেছে ও করে। রিণিরও রোগ ও রোগীর কথা জানতে সমান আগ্রহ।

একদিন রবিবার দু'জনে চলে গেল বোটানিক্‌সে। রিণিই বলেছিল "তুমি কোনোদিন ছুটি নিতে পার না? দু'জনে ঘুরে বেড়াই।"

"ঠিক আছে। আমার এক বন্ধু ডাক্তারকে প্রয়োজন হলে আমার পেসেন্টদের দায়িত্ব নিতে বলে আসব। দরকার হবে না জানি। এমন কোনো এখন তখন অবস্থার কেস্‌ নেই।"

অনেক ঘুরে-ফিরে ওরা এসে বসল বিখ্যাত বিরাট অশ্বত্থ গাছের তলায়।

আজকে নীল ঠিক করে এসেছিল কথাটা পাড়বে। রিণিকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। বেশ কিছুদিন থেকেই নানাভাবে ওকে যাচাই করেছে, নিজেকেও করেছে। এখন সে বুঝেছে, এ হঠাৎ কিছুর ব্যাপার নয়। এই ভালোবাসা গভীর।

নীল কোনোদিনই মেয়েদের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। ওর মা প্রায়ই বলতেন, "ছেলেটা কি শেষে সাধু হয়ে যাবে? ডাক্তার-নার্স নিয়ে কত কথা শুনি। কিন্তু নীলকে দেখে অবাক লাগে। কি

উদাসীন! বিলেতে এতদিন থেকে ফিরে এলো। কোনো পরিবর্তন নেই।"

মা-বাবা বলেছিলেন, "এবার ত বিয়ে করবি?"

"না, ইচ্ছে নেই।"

"তোর যাকে ভালো লাগে।"

একই উত্তর দিয়েছিল, "ভালো লাগা না-লাগার ত কথা নয়। ইচ্ছে নেই।"

ছোট ভাই ওকালতি পাশ করে ভাগলপুরে তাদের পৈত্রিক বাড়িতে তার বাবার জুনিয়ার হয়ে প্র্যাক্‌টিস করছে।

নীল বলেছিল, "তোমরা ভানুর বিয়ে দাও।"

শেষে তাই হয়েছিল। ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল। একটা ছেলেও হয়েছে।

সেই লোকের মনের আজ কত পরিবর্তন।

রিণির চাইতে বয়সে একটু বেশী বড় হবে। তা মনে হয়, আট-ন' বছরের বড় হবে। একটা দ্বিধা বোধ করছে। তারপর ভেবেছে, ওর আপত্তি নাও ত থাকতে পারে। কতদিন এই নিয়ে ভেবেছে, আর পিছিয়ে গেছে।

আজকে বলেই ফেলল, "রিণ, একটা কথা বলতে ..ই।"

রিণির বুকটা ধড়াস করে উঠল। ওর মনের দুর্বলতা কি নীল টের পেয়েছে? ওর যে রিণরিণকে ভালো লাগে, তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। রোজ ওদের কাছে চলে আসে। অন্য সব বন্ধুর কাছে বড় একটা যায় না। তা হবে বেশ কতদিন। মাস গড়িয়ে বছর পুরো হতে চলল বোধহয়।

এই নিয়ে সঙ্গীতা কত ঠাট্টাও করেছে, "একবার হেঁ কর না বাবা; দু'জনে এক সময়েই ঝুলে পড়ব।"

"তোরা দু'জনে ত পড়েই আছিস। আমি ঝুলেই থাকতে চাই।"

কখনও উত্তর দিয়েছে সোজা, "কি হবে রে? বেশ আছি।"

আবার এক সময়ে বলেছে, "দেখ, বিয়ে করা সম্ভব নয় আমার। কোনোদিন সময় হলে তোকে সব বলব।"

একথা বলতে বলতে কেমন যেন দুঃখের ভাব ফুটে উঠেছে ওর মুখে। তাই আস্তে আস্তে সঙ্গীতা ঠাট্টা করা ছেড়ে দিয়েছে। বোঝে না, তার বন্ধুর কি এমন কথা আছে যা বলবার সময় আসে নি।

নীলের কথাটা শুনে মনটা ওর চঞ্চল হয়ে উঠল। এখন কি হবে? এই বন্ধুত্ব ছুটে গেলে তাদের দু'জনেরই, মানে, মা'র ও তার দু'জনেরই বড় কষ্ট হবে।

কিন্তু উপায় নেই। তাকে শক্ত হতেই হবে। মাকে সে কোনো রকমেই, কোনো দিক দিয়েই আঘাত দিতে পারে না।

"আমি যে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই রিণ। শুনবে না আমার কথা?"

একটু চুপ করে থেকে রিণি বলল, "বেশ ত, বল। তুমি ত কত কথা বল। আজ হঠাৎ এভাবে কেন জিজ্ঞাসা করছ?"

"এটা যে বিশেষ কথা।"

"তবে থাক। বিশেষ কথা বিশেষ লোকের জন্যই থাক তোলা। আমি অতি সাধারণ, আমার ভাগে সাধারণ কথাই থাকুক।"

রিণির কথার ভঙ্গিতে নীলকণ্ঠ বুঝি একটু আঘাত পেল। একটু চুপ করে রইল। "ঠিক আছে। আর একদিন বলব।"

রিণি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। "চল নীল, আজকের মতো আমরা ফিরে যাই। বিকেল হয়ে আসছে। অনেকটা পথ যেতে হবে। এতটা পথ তোমাকে একা ড্রাইভ করতে হচ্ছে। দাঁড়াও আমিও ড্রাইভ শিখব। কি বল?"

নীল বুঝতে পেরেছিল, রিণির মনের মধ্যে কি যেন একটা বাধা আছে।

তার বয়সটা?

অন্য কেউ?

এতদিন ওদের সঙ্গে মিশে এটা বেশ ভালো করে বুঝতে পেরেছে, ওর জীবনে অন্য কোনো পুরুষ নেই। আর বয়সটা যদি বাধা হোত, তবে তার সান্নিধ্যে বেশীক্ষণ থাকত না।

ও বেশ বোঝে, রিণির ওকে ভালো লাগে। না হলে দিনের পর দিন নীলের সঙ্গে গল্প করেই ত কাটাচ্ছে। যাবার সময় বলে, "কাল এসো।"

সেও যেমন সারাদিনের শেষে রিণির কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত হতে থাকে, রিণিও মনে হয় তার জন্য অপেক্ষা করে।

এর পরে রিণি ক'দিন নীলকণ্ঠকে আসতে বাধা দিল। "না, থাক। আজ আর এসো না নীল। আঁকা নিয়ে ক'দিন বড় ব্যস্ত থাকতে হবে। বাকী ক'টা ছবি সাত দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। আম্মির চিঠি পেলাম, ওঁরা সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসছেন।"

"ওঁদের ছুটির দিন ফুরিয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি?"

"তা ঠিক নয়। আরও পাঁচ-ছ'টা দিন থাকতে পারত। কিন্তু মেসো ফিরে আসতে চাইছে। অনেক ক'টা বড় বড় কেস কোর্ট খোলার আগে প্রিপেয়ার করতে হবে।"

"আনন্দের দিনগুলো বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।"

"সত্যি, আমাদেরও দিনগুলো ফুরিয়ে এলো।"

"আজকে কেন যেতে বাধা দিচ্ছ রিণি?"

"উপায় নেই নীল। পাগলের মতো একটা দিন খাটতে হবে। মা এসে পড়লে তত সময় পাব না। আমার ত কলেজ খুলে যাচ্ছে। কিছু মনে কোর না, প্লিজ।"

"সাবধানে থেকো। কাল ফোন করব।"

নীল ফোনটা ছেড়ে দিল। রিণির হাতে তখনও রিসিভারটা ধরা। না করে দিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ছবি আঁকার কথাটা ত একটা ছুতো।

সন্ধেবেলায় কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম তার এমনিতেও দরকার। ছবি আঁকা তার এমনিতেও শেষ হয়ে এসেছে।

সে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। এইভাবে কি সে ডঃ চ্যাটার্জিকে সরিয়ে দিতে পারবে? ওকে ছাড়া জীবনটা কেমন হবে?

মা যখন বুঝতে পারবে, তখন তাকেই বা কি জবাবদিহি করবে? বেশ বুঝতে পারছে, মা'র মনটা ওকে পেয়ে কতটা ভরে উঠেছে। মনে হয়, তাদের জীবনে ওকে বড় দরকার।

সে এখন কি করবে? তিন-চারদিন সে নীলকে এড়িয়ে চলল। ভাবল অনেক কিছু।

কখনও মনে হয়, সব বলে দেখলে কেমন হয়? ও যদি সত্যি ওকে ভালোবাসে, তবে সব জেনে তাকে গ্রহণ করতে পারে, যেমন তার বাবা মাকে গ্রহণ করেছিল।

যদি সত্যি ওকে ভালোবাসে, তবে তার প্রিয়জনের জন্য 'স্যাক্রিফাইস্' সে করতে পারে। এতকাল মেয়েরা যা করেছে বা করে আসছে, তাই ত সে করতে বলবে। তার চাইতে ত বেশী কিছু নয়।

তবে হ্যাঁ, নতুন কিছু করতে চাইলে অন্তরায় যে অনেক, তা কি সে বোঝে না? কিন্তু তা বলে কি তা কোনোদিন হবে না? কেউ সেটা মাথা পেতে নেবে না? কাউকে ত নতুন পথে পা বাড়াতে হবে।

তাছাড়া সে নিরুপায়। এ পথ ছাড়া কোনো পথ তার খোলা নেই। কেউ যদি তার হাত ধরতে চায়, তাকে তার পথেই যেতে হবে।

কখনও ভাবে, কি দরকার সব বলে নীলকে। মেয়েব কোনো অভাব হবে না। কিছুদিন কষ্ট; তারপর তাব জীবনে হবে নতুনের আবির্ভাব।

তার নিজের কথা সে ভাবে না। প্যারিস যাবার আগে মা'র কাছে শুনে সে তার জীবনের ধারা ঠিক করে নিয়েছিল। এত বছর ধরে সে মনটাকে অন্যভাবে নিয়েছে গড়ে।

বিদেশে কতজন তার কত কাছে আসতে চেয়েছে। আগ্রহের

সঙ্গে, ভালোবাসার সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে। কিন্তু সে রয়ে গেছে অনড়, অটল হয়ে।

সে পারবে নীলকে প্রত্যাখ্যান করতে। সে মনের জোর তার আছে। ব্যথা সে পাবে ঠিকই, তবে তা জয়ও সে করতে পারবে। সামনে তার অনেক কিছু করবার রয়েছে।

সংসারে যে সেরকমভাবে না ঢুকেও মানুষ ভালোভাবে চলতে পারে এবং অনেক বড় বড় জিনিস দেশ ও দশকে দিয়ে যায়—এই দৃষ্টান্ত সে বিদেশে দেখে এসেছে। বিয়ে না করেও আনন্দের মধ্যে কাটায়।

কিন্তু, আম্মি ?

বড় ভালোবেসে ফেলেছে সে জীবনকে। তার মনে যেন একটা নতুন দিক খুলে গেছে। আনন্দ করে ওদের সঙ্গে কত জায়গাতে যায়। হাসি যেন আম্মির মুখে লেগেই থাকে। মা, মনে হয়, ও আসবে সেই অপেক্ষায় থাকে।

মাও যে কত ব্যথা পাবে নীলকে সরিয়ে দিলে বা নীল যদি সরে যায়। ওদের দু'জনেরই বয়স কম। তারা যা সহ্য করতে পারবে, মা'র এই বয়সে নতুন করে কোনো আঘাত কি সহ্য করতে পারবে ?

সে যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। কোন্‌দিকে যাবে কি করবে ?

"হে ভগবান, কেন তুমি আমাকে এই সমস্যার মধ্যে ফেলেছ, বলতে পার ? দয়া-মায়া বলে কি তোমার কিছু নেই ?"

মা-মেয়েতে বেশ দিন কাটছিল। কি দরকার ছিল নীলকে মাঝখানে এনে দাঁড় করাবার ? সে বিবাহিত হতে পারত। সে আর দশটা ডাক্তারের মতো হোতে পারত। হোত তাদের সঙ্গে রোগী ও ডাক্তারের সম্বন্ধ।

তবে ত এই সুখের একটা বছর আনন্দের বছর, নতুন স্বাদের একটা বছর তাদের জীবনে আসত না।

॥ কুড়ি ॥

তার মাথাটা নানা চিন্তায় ঝিমঝিম করতে লাগল। কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায় নি। টেলিফোনের আওয়াজে গেল তার ঘুম ভেঙে।

"হ্যালো, কি করছিলে? কোথায় ছিলে? তোমাব স্বরটা এত ভাবি ভারি লাগছে কেন? শবীব ভালো ত?"

"দাঁড়াও। এতগুলো প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে কি করে দেব? প্রথম—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দ্বিতীয়—তাই ফোনটা ধরতে দেরি হলো। তৃতীয়—স্বরটা তাই বেঠিক। চতুর্থ—শরীর বেশী রকম ভালো।"

"এই তোমার আঁকা হচ্ছে? এদিকে আমি ভালো মানুষেব মতো চুপটি কবে দিন কাটাচ্ছি। বিণ আঁকছে, বিণিব একজিবিশন। আমি কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলা, মানে ডাক্তারের সন্ধেবেলা আসছি।"

ফোনের মধ্যেই রিণির হাসি রিণবিণ করে ভেসে এলো।

"এতে এত হাসির কি হোল?"

"হলো না? কেমন বললে ডাক্তারের সন্ধে। একটা নতুন কথা কিন্তু আবিষ্কার হোল।"

রিণির হাসিখুশি গলাটা শুনে ডাক্তারের আশা গেল বেড়ে।

"এই কিন্তু ঠিক হলো। এখন ফোনটা ছাড়। আবার কখন মত বদলাবে। আর্টিস্ট বলে কথা।"

"ঠিক কিন্তু বলো নি। মত দিলাম কখন যে বদলাতে হবে?"

"সে কি? মানা করছ যেতে?"

বড় ভারী শোনাল। মনে হলো, গলার আওয়াজ যেন বুজে আসছে। বড় আঘাত পেল রিণি। সে ত চায় না ওর মনে কষ্ট দিতে।

তাড়াতাড়ি বলল, "প্লিজ, ফোন ছেড় না। রাগ করলে ?"

"না, ভাবছিলাম—তোমার মা থাকলে এ হোত না।"

মা'র কথা ওঠাতে রিণি কেমন যেন হয়ে গেল। ঠিকই, ওর মা বড় স্নেহ করেন নীলকে। তার এইভাবে মাকে আঘাত দেবার কি অধিকার আছে!

"ঠিক আছে। এসো। তবে জান, নীল, বড় টায়ার্ড। তাই একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। বাইরে খাওয়া যাবে, আর কোনো ভারী আলোচনা—স্পীকটি নট।"

ডঃ চ্যাটার্জির মনের অবস্থা সত্যিই অসুবিধার। ক'টা দিন রিণকে না দেখে, ওর কথা না শুনে ও আর পারছিল না। তাই ও যা বলল, তাতেই তথাস্তু করল। চোখের দেখা ত মিলবে।

সেদিন সন্ধেটা বড় হাসিখুশির মধ্যে কেটে গেল। এতদিন পরে দেখা হওয়াতে দু'পক্ষই কথায় উজ্জ্বল, ভাবে উচ্ছল।

রিণির মন হাল্কা—কোনো কথা উঠবে না। নীল তার কথার খেলাপ করবে না।

"কি সুন্দর ছবি আঁক তুমি! তোমার প্যারিসে গিয়ে শেখা সার্থক হয়েছে।"

"তা ঠিক আমি মনে করি না, নীল। ওখানে গিয়ে আমি অনেক শিখেছি, অনেক দেখেছি। শুধু অঙ্কন বিদ্যা নয়, আজ আমি যা তা হতে পেরেছি। তবে সত্যিকারের পথ দেখিয়েছে আমার দেশ। এই রঙে-রসে ভরা দেশে যে সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে আর কোথায় পাব তা আমি ? সেই চোখ কিন্তু খুলে দিয়েছে বিদেশ ও বিদেশী শিক্ষা।"

"ঠিকই বলেছ তুমি, রিণ। অজন্তার আঁকা চিত্র হাজার বছর আগের। তাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এ বিদ্যায় আমরা অগ্রণী ছিলাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যাক, ভারী ভারী কথা। প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙব না। এই ক'দিন কি আঁকলে তাই দেখাও।"

"বারে, তা দেখতে কেন দেব? সেই বিশেষ দিনে সব দেখবে একসঙ্গে।"

"বললেই হোত, সেই বিশেষ দিনে সবার সঙ্গে গায়ে গা ঘেঁষে দেখবে। তুমি কোথাকার কে যে সবার আগে দেখবে?"

রিণি কথাটা শুনে হেসে ফেলল, "আমি ঠিক সেভাবে বলিনি। সব শিল্পীই চায় তার শিল্প পূর্ণতার মধ্যে দেখাতে। এমন কি অর্ধেক অপারেশন করে কি কোনো ডাক্তার কাউকে দেখাতে পারে? সব শেষ করে মনের তৃপ্তিতে বলে—কোনো কিছু ভাববার নেই, সুষ্ঠুভাবে হয়েছে।"

"ওরে বাবা, আমাদের অপারেশন আর তোমাদের আঁকা এক পর্যায়ে ফেলে দিলে? শত মাথা কুটেও কিন্তু এ তুলনা আমার মাথায় আসত না। আমি এই চুপ করলাম।"

রিণ অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে হেসেছিল ওর কথার ভঙ্গিতে। দুজনে গিয়ে ঢুকেছিল একটা হোটেলে। চাইনিজে।

ওঁরা তবে ফিরে আসছেন শীগ্‌গির?"

"তাই ত লিখেছে আম্মি। আরও ক'টা দিন থাকলে ভালো হোত। মাসী-মেসো দু'জনেই অনেকটা স্থির হয়ে এসেছে। বুঝতে পারছি আম্মারও আর ভালো লাগছে না আমাকে ছেড়ে থাকতে। ওরা চলে এলেই ভালো। আমারও ভালো লাগে না একা একা। কে জানে, কখন কে মায়া কাটিয়ে চলে যাবে। এই বেলা যতটা পারি সান্নিধ্য সঞ্চয় করে রাখি।"

নীলের চোখে পড়ল রিণির মুখে-চোখে বিষাদের ছাপ।

তাড়াতাড়ি ও বলে উঠল, ও কথা কেন ভাব? ওনার কি বা বয়স?"

"বাবারই বা কি বয়স ছিল? বলতে পার সারা জীবন কেন আম্মি একটার পর একটা দুঃখ পেল? দেবী কি রকম হন জানি না। তাঁরা কি আমার মা'র চাইতেও ভালো হতে পারেন?"

"তুমি এত ভাব কেন, রিণি ? আমি বলছি, উনি অনেকদিন থাকবেন তোমার পাশে পাশে আর তুমি চিরদিন তাঁর মনে আনন্দের রেশ তুলবে রিণরিণ করে।"

রিণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে।

ওর হাতটা নেড়ে নীল বলে উঠল, "কি হোল তোমার ? অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ ?"

"আমি ভাবছি, তুমি কি করে বাবার কথাগুলো বললে ?"

"কি রকম ?"

"আমার বাবাই আমার নাম রেখেছিলেন, আর এই কথাই বলেছিলেন। কিন্তু বাবার জীবনে তা ঘটে নি। মা'র জীবনে যেন সত্যিকার তাই করতে পারি, সেটাই আমার একমাত্র কাম্য। আমার বাবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতেই হবে। ধন নয়, মান নয়, শুধু এইটুকু আমি চাই।"

"তাই হবে দেখো," নীল বলল।

ততক্ষণে বেশ জোরে জোরে গান ও বাজনা আরম্ভ হয়েছে।

"এই হট্টগোলের মধ্যে বসা যাবে না। চল বাড়ি যাই।"

"তাই চল।"

দু'জনে এসে ঢুকেছিল রিণির ফ্ল্যাটে। তারপর দু'দিন রিণি যাকে বলে নিরুপদ্রবে শুধু এঁকেই চলেছিল। ঠিক করেছিল সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলবে এই দু'দিনে। তারপরেও অবশ্য মাস খানেক থাকবে হাতে। সেটা রাখবে শুধু ফিনিশিং টাচ দেবার জন্য।

খাওয়াটা একতলাতেই গিয়ে খেয়েছে। সব শেষ করে রাতে মনটা বেশ হাল্কা লাগছিল। ভেবেছিল খাওয়ার পরে আচ্ছাসে রাতে ঘুমোবে। অনেক রাত জেগে এঁকেছে ক'দিন। খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু আশ্চর্য। কোথায় ঘুম ?

সমস্ত রাত একফোঁটা সে ঘুমোতে পারল না। নানা চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করে আসতে লাগল।

যে অজুহাত দেখিয়ে নীলকে সরিয়ে রেখেছিল, ওর মুখে হাত চাপা দিয়েছিল, এখন তা হয়ে গেল শেষ। তাকে এখন মুখোমুখি হতে হবে নীলের সেই বিশেষ কথার সঙ্গে।

ও ত খুব ভালো করেই জানে বিশেষ কথাটা। একবার ভাবল, আম্মি আসা অবধি বুদ্ধি করে পিছিয়ে দিলে কেমন হয়? আবার ভাবল এভাবে এড়িয়ে ক'দিন যাওয়া যাবে? এইভাবে চলতে নিজের কষ্ট হচ্ছে, আর নীল ত জানি কত ব্যথা পাচ্ছে। যা হবার তা হয়ে যাওয়া ভালো।

কষ্ট যা পেতে হবে তা হবেই।

নীলকে যে এভাবে ধরে রাখা যাবে না, তা ঠিক। সব জেনে নীল যদি সরে যায় যাবে। তবে ওর কাছে ফিরে আসার পথ, মনে হয় চিরকালই খোলা থাকবে।

তার মনে বড় গভীর রেখাপাত করেছে নীল। তা মনে হয় না, কোনোদিন মুছে যাবে। যতদিন বেঁচে থাকবে, সেই ক্ষতের উপরই তার মনের স্রোত ঘুরপাক খাবে। হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা বোধ করল। বুকটা চেপে ধরে সে শুয়ে রইল আর চোখ দিয়ে নামল জলের ধারা। কখন যেন শান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

নীলকণ্ঠ হাসপাতালে গিয়ে ফোন করল। আজকে সে যেমন করেই হোক দেখা করবে। ফোন বেজেই চলেছে। কোনো সাড়া নেই। দুবার, তিনবার চেষ্টা করেও যখন সাড়া পেল না, সে স্থির হয়ে আর থাকতে পারল না। অন্য এক সহকর্মীকে গিয়ে নিজের শরীর খারাপ লাগছে বলে বেরিয়ে পড়ল রিণির উদ্দেশ্যে।

ভিতর থেকে দরজা বন্ধ, তার মানে বাইরে যায় নি। যাবার কথাও নয়।

জোরে জোরে কয়েকবার বেল বাজাবার পর ঘুমন্ত চোখে রিণি

দরজা খুলে দিল। রাতের কাপড় পরা। চুল এলোমেলো। বোঝাই যাচ্ছে সদ্য বিছানা থেকে উঠে এসেছে।

"একি, রিণি, এতক্ষণ তুমি ঘুমুচ্ছিলে? তোমার অসুখ করে নি ত?" বলতে বলতে ডঃ চ্যাটার্জি ঘরে ঢুকেই রিণির কপালে হাত দিল।

"না জ্বর ত নেই। তোমার মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?"

রিণি সেই মুহূর্তে স্বপ্ন দেখছিল, নীল মুখ ভার করে চলে যাচ্ছে। ওর মতে সব করা তার পক্ষে ঠিক নয়। ঠিক সেই মুহূর্তে নীলকে সামনে দেখে কেমন হকচকিয়ে গেছে।

"কি হয়েছে? অমন করে তাকিয়ে আছ কেন, রিণ? আমায় বল।"

"তুমি চলে যাও নি?"

"সে কি? আমি ত এই এলাম। হাসপাতাল থেকে বারে বারে ফোন করে কোনো সাড়া না পেয়ে সোজা এখানে চলে এলাম। খেটে খেটে তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে। ক'দিন আর কিছু তোমাকে করতে দেব না।"

ততক্ষণে রিণরিণ প্রকৃতিস্থ বোধ করছে। বুঝেছে সে স্বপ্ন দেখছিল।

"যাও রিণ, হাত-মুখ ধুয়ে এসো। আমি চট করে কফি ও ডিমভাজা তৈরি করছি। নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে। এত বেলা অবধি কিছু খাওনি।"

নীল রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

কফি খেতে খেতে নীল বলল, "রিণ, তুমি শুয়ে শুয়ে বই পড়। তোমার ফ্রিজে দেখলাম ইলিশ মাছের টুকরো। গ্র্যাণ্ড বুদ্ধি মাথায় এসেছে। আমি চট করে খিচুড়ি আর ইলিশ ভাজা করছি। সারাদিন কাজে বের হব না বলে এসেছি। বিশেষ কোনো আর্জেন্ট কল থাকলে এ বাড়ির ফোন নম্বর দিয়ে এসেছি। কি, বুদ্ধিটা ভালো হয় নি?"

এতক্ষণে রিণি বেশ স্বাভাবিক বোধ করছে। নীলকে পাশে পেয়ে মনটা আনন্দে ভরে গেছে। ভাবছে নীলকে ছেড়ে কি করে দিন কাটবে? আবার ভাবছে নীল ত সব কথা মেনেও নিতে পারে।

"কি? কথাটা পছন্দ হলো না?"

"খুব ভালো বুদ্ধি। আমি কিন্তু কুটোটিও নাড়ব না। খুব আলসেমীতে পেয়েছে। আর মনে হচ্ছে খিদেও খুব পাবে।"

"একটা কাজ কিন্তু তোমায় করতে হবে।"

"না বাপু, আমার দ্বারা কিছু হবে না।"

"নিচে গিয়ে বলে এসো, তুমি আজ যাবে না খেতে।"

"কি কাণ্ড বল ত। ভুলেই গেছি।"

তুরদার করে নিচে নেমে গেল রিণি। রান্নাঘরে একবার উঁকি দিয়ে এসে রিণি টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। বড় ক্লান্ত লাগছিল। সারা রাত ঘুম হয় নি।

তাছাড়া মনের ভিতর থেকে কে যেন আশ্বাস দিচ্ছে, আজকে সব চিন্তার অবসান হবে।

"মেমসাহেব, উঠুন। খাবার টেবিলে লাগান হয়েছে।"

চোখ মেলে রিণি ফিক করে হেসে ফেলল।

"আপনার গোলামের সেলাম নিন," মাথা ঝুঁকিয়ে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে দিল নীলকণ্ঠ।

খাবার ঘরে এসে রিণি ত অবাক। টেবিল ভর্তি খাবার—মাছ, মাংস, মিষ্টি, চাটনি, ডালনা। তাছাড়া অবশ্য খিচুড়ি, মাছ ভাজা, আলুর দমও আছে।

"কি কাণ্ড করেছ, তুমি? কিন্তু মাংস ত ফ্রিজে ছিল না। আর এ ধরনের মাছ?"

"ফুস মন্তরে এক অনেক হয়ে গেছে।"

"রাখ তোমার ফাজলামি।"

"আসল কথা হচ্ছে আমি এসেছি ও রান্না করছি জেনে তোমার নিচের তলার মাসী দু'জনের জন্যই খাবার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"আমি যে না করে এসেছিলাম।"

"কানে তোলেন নি কথাটা। ভেবেছেন এতবড় একটা ডাক্তার, তার ত মান রাখতে হবে। মেয়েটার ত বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। মা থাকলেও বা কথা ছিল।" একটু থেমে সে বলল, "একি? এত শোনার পরও চুপ করে রইলে। ব্যাপার ত সুবিধের ঠেকছে না।"

"আমার কেমন লাগছে।"

"কোনো কিছু লাগবার নেই! আমি সব প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। নিচের মাছ, মাংস, তরকারী ফ্রিজে রাতের জন্য ঢুকিয়ে রাখছি। আর একরকম মিষ্টি। এবেলা আমার রান্নাই খাওয়া হবে। সঙ্গে চাটনি আর মিষ্টি যোগ হবে।"

খাবার পরে দু'জনে এসে বসল শোবার ঘরে।

"কাল সবাই এসে পড়ছেন। আমার কথা কিন্তু আজ তোমায় শুনতেই হবে রিণ।"

॥ **একুশ** ॥

রিণরিণ এর জন্যই অপেক্ষা করছিল। এই প্রশ্নটার জন্যই মনে হোল সে প্রতি মুহূর্ত গুনছিল। আজকে এখনই সেসব বলবে নীলকে।

সময়ের শেষ মুহূর্তে তার জীবনের কাঁটা এসে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখল, নীল একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মুখেও চিন্তার রেখা।

কি হবে? ভালো কি মন্দ, সুখের বা দুঃখের? কোনো কিছু জানা নেই।

মনে হলো, সব দ্বিধা ঠেলে ফেলে দিয়ে নীলকণ্ঠ বলে উঠল—

"রিণি, আমি চাই তুমি আমার হয়ে/ আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, রিণি। অনেকদিন ধরেই ভাবছি, বলব। পারছিলাম না বলতে।"

রিণি কি বলতে যাচ্ছিল।

থামিয়ে দিয়ে নীল বলল, "আমাকে সব বলবার সুযোগ দাও আগে। আমি বিয়ের কথা কোনোদিন ভাবিনি। মেয়েদের ওপর আমার কোনোদিন আকর্ষণ ছিল না। সবাই বলত অস্বাভাবিক। হবেও বা। তাই আমি ছিলাম। এখানে ডাক্তারী পাশ করে বিদেশে গেলাম বিশেষজ্ঞ হতে। ওখানে এবং ওই পরিবেশেও মনে কোনো চঞ্চলতা আসে নি। দেশে আসার পরে বাবা-মা ধরলেন। তাঁরা অবশ্য আমার মনোভাব জানতেন। যাই হোক, ছোট ভাই ভানুর বিয়ে দিতে বললাম। আমার আশা ছেড়ে দিয়ে ওঁরা ভানুর বিয়ে দিলেন। আমার ভাইয়ের এখন দুটি ছোট ফুটফুটে ছেলে। মা-বাবা সেদিক দিয়ে শান্তি পেয়েছেন। তবুও আমার জন্য ভাবেন, বলেন,—যাকে ভালো লাগে তাকেই বিয়ে কর। জানবি সবেতেই আমাদের মত আছে। বলেছি, সেরকম যদি এ জীবনে ঘটে তোমাদের জানাব। এতদিন পরে সেইদিন এসেছে। তুমি এসো আমার জীবনে।" নীল থামল।

নিশ্চলভাবে রিণিকে বসে থাকতে দেখে নীলের মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল।

"বল রিণি, আমার বয়স বেশী। তাই কি?"

"না না," আর্তনাদ করে উঠল রিণি। "একথা বোল না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, নীল। প্রাণের চাইতেও। কোনোদিন কাউকে ভালোবাসিনি এমন করে। কিন্তু···এ ত হবার নয়।"

আবেগে নীল ওর হাতটা চেপে ধরল, "আমার বুক থেকে পাথর নেমে গেছে। দু'জন দু'জনকে ভালোবাসি। তারপর আর ত কোনো বাধা থাকতে পারে না। তোমার মা আমাকে ভালোবাসেন, আমি বুঝি। আমার বাবা-মা তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবেন। আর কিসের বাধা?"

"অনেক কথা রয়েছে। জানলে বুঝবে—এ হয় না, হবে না। তাই কোনোদিন আমি বিয়ে করব না—এই আমার প্রতিজ্ঞা। তুমি জান না, নীল, এই জন্য মন আমার ভেঙে যাচ্ছে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে, কিন্তু উপায়হীন হয়ে আমার তাই করতে হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে কাউকে জীবনে পাবে, যে তোমাকে শান্তিতে, আনন্দে ভরে রাখবে।"

"না রিণি, না, তোমাকে ছাড়া আমার কোনো পথ নেই। তুমি এটা জেনো, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তোমাদের একজন হয়ে থাকব। তা থেকে যেন আমাকে বঞ্চিত করো না।"

"এ কথা যখন বললে, তখন তোমাকে আমি সব খুলে বলব যা তুমি কখনও আর কারো কাছে উচ্চারণ করবে না।"

"কথা দিলাম।"

"আমার মা, যার কোনো তুলনা নেই, তাঁর জন্ম রহস্যাবৃত।"

"মানে ?"

"অধীর হয়ো না। আমি তোমাকে আজ সব বলব। মাদ্রাজে, ওখানকার রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামীজী রাস্তার ধুলো থেকে কুড়িয়ে পেলেন সাত রাজার ধন এক মাণিক। আমার দিদিমা সারদা দেবী তাকে মানুষ করেন। তাঁর কথা তুমি সবই জান।"

"তাঁর দেওরের মেয়ে।"

"না, তা নয়। সেটা সংসারের ঝাপ্টা থেকে বাঁচাবার জন্য সবাইকে বলেছিলেন। মা তাই জানতেন। আমার দিদিমা মারা যান মা যখন এম এ পড়তেন। তখনও ঠিক কথা কিছু তাঁকে জানান নি। যখন আমার বাবা বিয়ে করতে চাইলেন, তখন মহারাজ প্রথম মাকে সত্য কথা জানান। এর পর ঠিক করেছিলেন সংসারের বাইরে থেকেই জীবন কাটাবেন। সরে দাঁড়িয়েছিলেন আমার বাবার জীবন থেকে। হ্যাঁ, একটা কথা বলিনি—মহারাজ আমার মাকে দেখেছিলেন অমৃতস্য পুত্রী হিসাবে। তাই নাম রেখেছিলেন অমৃতা। আমার বাবা সব জেনে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন আমার মাকে।

রিণির চোখ টল টল করে উঠল।

"বড় শান্তিতে ছিলেন দু'জনে। কিন্তু সে সুখের ঘর গেল ভেঙে। বাবা চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে সেই জগতে, যেখান থেকে আর ফিরবেন না। তার পরের কথা তুমি সবই জান।"

নীল একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে সরে এলো রিণির কাছে। হাতটা রাখল তার হাতের উপর।

"শোন, রিণি। তোমার বাবা যখন বিয়ে করেছিলেন, তখন করেছিলেন মহৎ কাজ। এখন দিন বেশী না হলেও কিছুটা পাল্টেছে। আরও এগিয়ে যাবে। সে যুগে যা হয়েছিল, তা এখন কেন হতে পারবে না? আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি। তোমার যদি, তোমার মা'র অবস্থা হোত, তাও তুমি হতে আমার কাছে পরশমণি। তোমার বাবার মতো উঁচু আসনে বসবার সুযোগ আমার কোথায়? তোমার বাবা ও মা দু'জনেই সাধারণের অনেক উর্ধ্বে। মাকে এতদিন দেখলাম। এমনটা আর দেখিনি। মনে হয় না, দেখবো বলে।"

রিণরিণের মনটা আনন্দে গেল ভরে। সব জানার পরে তার মাকে এত শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাচ্ছে।

"সত্যিই তুমি আমার মাকে সব জেনে এত ভালোবাস? কি যে ভালো লাগছে আমার।"

আনন্দের চোটে হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল ও। আবেগে জড়িয়ে ধরল নীলকে।

নীল আস্তে আস্তে বিণরিণের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

এই ছোট্ট মেয়েটিব মনের গভীবতা তাকে স্পর্শ করল। বাইরের থেকে ধরা যায় না এত বেদনা এর মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

লুকিয়েই বটে।

হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল মেয়ে। খুশীর আলো ঠিকরে পড়ে দু' চোখ দিয়ে। কথার ফুলঝুরি। মনে হোত জীবনের আনন্দধারা। যেন আঘাত কোনোদিনই সেরকমভাবে একে স্পর্শ করে নি। অবশ্য প্রথম দিন

মা'র জন্য ব্যাকুলতা বুঝিয়ে দিয়েছিল সহজ, সরল, নরম মনের মেয়ে। ভালোবাসার শক্তি এর আছে। তাই ত মাকে এতখানি ভালোবাসতে পেরেছে।

সেটাই ডঃ চ্যাটার্জিকে আকর্ষণ করেছিল প্রথমে। আজকালকার জগতে এই জিনিসের বড় অভাব। সকলেই নিজেদের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

"কি যে আমি করি," বলে সলজ্জভাবে নীলকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল রিণি।

অনেকক্ষণ ওরা দু'জনে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

"এস রিণি, আমরা বসি। কতদিনের অনিশ্চিত ভাবের অবসান হোল। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে।"

রিণির বুকটা কেঁপে উঠল। এই মানুষটাকে সে কি করে বলবে —ঝামেলার ত এ অবসান নয়, এ যে আরম্ভ। তার যে অনেক কথা এখনও বাকি রয়েছে। এখনও পেরোতে হবে অনেক গলি।

এখন যা সে বলতে যাচ্ছে, তা আরও কঠিন। একেবারে নতুন পথ, নতুন কথা।

তার হাত ধরে কি নীল সে পথে পা বাড়াতে পারবে? মনে মনে যা সে ঠিক করে রেখেছে, তার থেকে ত সে সরে আসতে পারে না। কয়েক বছরের অনেক চিন্তায় সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে।

সে জানে, এর জন্য তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সমাজের এই শক্ত পাহাড়প্রমাণ বাধাকে ভাঙতে হবে। যে-কোনো মহৎ পরিবর্তনের জন্য যে এগিয়ে যায়, সে বোধহয় পাষাণ কারার এদিকেই মাথা খুঁড়ে শেষ হয়ে যায়।

এইভাবে অনেকের ত্যাগের পরে দু' পা এগোবার সঙ্কীর্ণ পথ দেখা যায়। সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে যে আলো ছিটকে এসে পড়ে, সেই আলোই পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় শত শত লোককে।

"কি হলো, রিণি? কথা কইছ না কেন?"

"কি বলব, নীল? বলার যে অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে। তাই বলছিলাম, আমার আশা তুমি ছাড়ো। মরীচিকার পিছনে ছুটে জীবনটা দুঃখময় করো না। মনে কর, আমি আর দশটা মেয়ের মতো নই। যা হয় নি, কবে হবে তার ঠিক নেই, তাই নিয়ে আমি পড়ে আছি। কি দরকার সেসব কথা শুনে? তার চাইতে আমরা বন্ধু হয়ে থাকব। তুমি তোমার পথে যাও। জেনো, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তোমাকেই ভালোবেসেছি, তোমাকেই ভালোবাসব। আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নীল ওর দিকে। আবার কি হলো? যা বলবার ছিল, সব ত বলা হলো। আবার কিসের হেঁয়ালি? কেন ও এগিয়ে এসেও বারে বারে পিছিয়ে যাচ্ছে? কেন ও বুঝছে না ওকে অদেয় ওর কিছু নেই? ওর জন্য সে সবকিছু করতে পারে। কেন ও বিশ্বাস করতে পারছে না?

"রিণ, এটা কেন তুমি বুঝছ না—আমি পথেই থাকি বা ঘরেই থাকি, চোখের সামনে বা দেখার বাইরে, তুমি হবে আমাব চিরকালেব সঙ্গী। জন্ম-জন্মান্তরের সাথী। আমার মনের এই কথা কি তোমার প্রাণে বাজছে না? আমাব হৃদয়েব ব্যাকুল কথা কি তোমার কানে যাচ্ছে না বল, রিণ, বল। তুমি বলেছ, আমায় ভালোবাস। এই আমার পরম তৃপ্তি। আমার ভালোবাসা ব্যর্থ হয় নি। এতেই আমি পূর্ণ। তাও বারে বারে জিজ্ঞাসা করি—তোমার কথা আমায় জানতে দাও, তোমার ব্যথা আমায় বুঝতে দাও। বলবে না রিণি?"

নীলের কথা শুনে রিণি আর চেপে থাকতে পাবল না।

"আমি বলব। সব তোমাকে বলব। তুমি প্রত্যাখ্যান করলেও আমি বলে মুক্ত হতে চাই।"

"এতকাল মেয়েরাই নিজেদের সত্তা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে তবেই ছেলেদের হাত ধরতে পেরেছে। যেখানে তাদের জন্ম, যারা তাদের কষ্ট করে বড় করে তুলেছে, তাদের কোনো কিছুই তারা রাখে না।

তাদের অস্তিত্বটুকুও মুছে দেয়। নতুন পরিচয়ে পরিচিত হয়। কিন্তু কেন? কেন তা চিরকাল হবে? কেন ছেলেরা মাঝে-মধ্যে ত্যাগ করবে না তাদের ভালোবাসার মানুষের জন্য?" একটু থেমে রিণ আবার বলল, "বুঝি যে আগে বড় কারণ ছিল। মেয়েরা শিক্ষায় ছিল পিছনে, রোজগারের পথ ছিল তাদের জন্য বন্ধ। সাংসারিক জীবনে সেটা সবচাইতে বড় পাথেয়। কিন্তু, এখন? তাই, কেন সেরকম উপযুক্ত মেয়েরা পারবে না মা-বাবার নাম অক্ষয় করে রাখতে? তখন দেখো, মেয়ে হলে কারও মুখ কালো হবে না। সবদিকে যখন ছেলে-মেয়ে এগোবার চেষ্টা করছে, সামাজিক দিকেই বা কেন করবে না?"

আবার একটু থেমে রিণ বলতে শুরু করল, "যাক একসঙ্গে অনেক কিছু বলে ফেললাম। আমার মন হলো হাল্কা। তুমি এখন বুঝবে, কেন বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যতদিন বেঁচে থাকব, আমার মা-বাবার নাম ছড়িয়ে চলব। যখন থাকব না, তখনকার কথা ভাবি না। আমার যদি ভাই থাকত, এতটা বোধহয় ভাবতাম না।"

চুপ করে গেল রিণি। মনে হোল, ও যেন বর্তমান আবহাওয়া থেকে কত দূরে সরে গেছে। ও কি চলে গেছে মা'র কাছে? হতে পারে বাবার সান্নিধ্য পাবার চেষ্টা করছে। বোধহয়, বাবার কানে কানে বলতে চাইছে—তোমার রিণরিণ, তোমাদের নাম রিণরিণ করে বাজিয়ে চলবে।

নীল অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

রিণি যা বলেছে, তা মোটেই যুক্তিহীন নয়। সত্যিই ত কেন তা হতে পারে না? পুরুষ শাসিত এই সমাজ, তাই কোনোদিন মেয়েদের কথা ভেবে দেখে নি। এটা একটা বড় অস্ত্র, যা দিয়ে মেয়েদের চেপে রাখা সম্ভব। তাই এই ব্যবস্থা। জার্মানীতে ত এই কিছুদিন আগে আইন পাশ হয়েছে। পদবীটা বড় কথা নয়। তাই যারা বিয়ে করবে তারা বিয়ের সময়ে যে পদবী ইচ্ছা নিতে পারে। এমন কি দুটো পদবীই একসঙ্গে নিতে পারে। তাতে কিছু আসে-যায় না।

সবই কি পশ্চিম প্রথমে করবে? তার বহু বৎসর পরে আমরা অনুসরণ করব?

কিছু কিছু বিষয়ে কেন আমরা অগ্রণী হব না? কদম কদম বাড়াতে গেলে সব দিকেই বাড়াতে হবে।

তাছাড়া রিণি একমাত্র সন্তান। সে কি করে তার মা-বাবার নাম লুপ্ত করে দেবে? তবে ত সে অনুপযুক্ত সন্তান।

ছুটি থাকলেও বা কথা। তার নিজের মা-বাবার ভানু রয়েছে। শুধু তা নয়, তার ছুটি ছেলেও হয়েছে। তাদের এ বিষয়ে আপত্তি করা বা মনে ব্যথা পাওয়া অন্যায় হবে। এও সে জানে, যা ঠিক তা তাঁরা মেনে নেবেন। চিরকাল তাই সে দেখেছে।

তবে সে রিণির মতে কেন মত দেবে না? অমৃতা মা'র ত সেই হবে একমাত্র ছেলে, রিণি যেমন একটি মেয়ে।

রিণি মনে মনে বুঝতে পারছিল, নীলকণ্ঠের পক্ষে এতে রাজি হওয়া সম্ভব নয়। আগে যা শুনেছিল তাতে রাজি হওয়া যত সহজ, এ ত তা নয়। ওতে তার দাঁড়াতে হবে রুখে। যা সমাজে হয় না, সবার সামনে খোলাখুলি তা করতে হবে। অগোচরে নয়, চুপিসারে নয়।

কিন্তু তা বলে রিণিকে ত থাকতে হবে সোজা হয়ে সোজা পথে। তার মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেও এই তার পথ। এই পথেই সে চলবে।

হঠাৎ নীলের গম্ভীর আওয়াজে রিণি চমক ভেঙে ফিরে তাকাল।

"শোন রিণি, তোমার সব কথা শুনে আমি এতক্ষণ ভাবছিলাম। সবদিক চিন্তা করে, আমার কর্তব্য আমি ঠিক করেছি।"

রিণ শুধু ওর মুখের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

নীল বলল, "প্রথমে মনে হয়েছিল, উল্টো কাজ কেন করতে চাইছে রিণি। ভেবে দেখলাম যে এটাই ঠিক। এই ত হওয়া উচিত।

দু'জনের অধিকার যেদিন সমান বলে গ্রাহ্য হবে, সেদিনই সত্যিকারের ভালোবাসা হতে পারে। সেই সত্যের পথে আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই। আমরা দু'জন দু'জনকে সাহায্য করব নতুন পথে চলবার।"

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়বার আগে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবীরের রং-এ রাঙিয়ে দিল দু'জনকে। প্রসন্ন মনে যেন বলে গেল —"মেয়েদের গোপন ব্যথা তোমরা অনুভব করেছ—হোক জয়, জয় হোক তোমাদের।"

—